পরবাসী

– স্বপন চক্রবর্তী

ঢাকা শহরের রায়েরবাজারের চার তলার ঘরে শুক্রবারের মোহন সকাল। অপরেশ ঘুম থেকে জেগেই দেখলেন তার দুই সন্তানের জননী শীলা এপাশ ফিরে এক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

কি গো, কি দেখো অমন করে? অপরেশ প্রশ্ন করেন।

তোমাকেই। শীলার ছোট্ট উত্তর।

আজ তোমার একটু আগেই ঘুম ভেঙে গেল? শীলার প্রশ্ন বিছানা ছাড়তে ছাড়তে।

তুমি তো বললে না কি দেখছিলে অমন এক দৃষ্টিতে। অপরেশের প্রশ্ন একই ভঙ্গিতে বিছানায় শুয়ে।

বললাম তো, তোমাকেই।

আমায় কি আজ নতুন দেখছো? না কোনো কারণ আছে?

প্রতিদিন ভোরেই তো ঘুম থেকে জেগে কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তোমার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। এভাবেই আমার চোখের আলোয় তোমার মুখখানি ধরে রাখি সারা দিনের জন্য। সমস্ত দিন তো আর তোমায় দেখতে পাবো না। এমনকি ছুটির দিনগুলোও তুমি নিয়ম করে বাইরে আড্ডায় কাটিয়ে আসো। তোমার এ ঘুমন্ত মুখই সারা দিনের সঙ্গী হয়ে আমার সঙ্গে থাকে। এবার বুঝলেন মশাই! এক নাগাড়ে এক রকম নাটকীয় ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে শীলা থামলেন।

এক অসম্ভব ভালো লাগায় ভিজতে ভিজতে তীব্র আবেগে অপরেশ স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিলেন। এ সাতসকালেই পুনর্বার দুজনে ভালোবাসার স্বর্গখানি নামিয়ে আনলেন অলৌকিকভাবে বারো বাই আটের ছোট ঘরখানায়।

অপরেশ জেগেই মাথার কাছে চিরকুটটিতে ঘুম ঘুম চোখে দৃষ্টি রাখলেন। তাতে কোনো সম্বোধন নেই, কখনো থাকে না। শুধু কয়েকটি নির্দেশ লেখা রয়েছে তাতে।

এক. কাজে যাবার আগে লন্ড্রিটা করে যেও।

দুই. সুজনদের স্কুল থেকে এনে ওদের পিৎজা কিনে দিও।

তিন. রাতে দরজাটা একটু শব্দ না করে খোলো। এমন শব্দ করে খোলো, ঘুম ছুটে যায়।

নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিন–এর ছোট দুই রুমের বাসায় সূর্যের আলোর কোনো প্রবেশ অধিকার নেই। তাই বোঝা যায় না দিনের কয়টা বাজে।

অপরেশ বুকের ভেতরের একটি দীর্ঘশ্বাসকে চাপতে চাপতে খাট থেকে নেমে পড়লেন। গত সাত বছর যাবৎ অপরেশ ও শীলা নিউ ইয়র্কে পরবাসী। শীলা প্রতিদিনই ভোর পাচটায় উঠেই বেরিয়ে যান ফুড স্টোরের কাজে। ফেরেন বিকাল ছয়টায়। সকালের নাশতা কাজের জায়গাতেই করেন। বিকেলে ফিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে দেশে আত্মীয়দের সঙ্গে কিংবা আশেপাশের পরিচিতদের সঙ্গে কিছুক্ষণ টেলিফোনে ভ্যাজর ভ্যাজর করে ছেলেমেয়েদের খাইয়ে, নিজে খেয়ে সটান বিছানায়। শোবার সময় দরজাটা আটকাতে ভোলে না কখনো। অপরেশ শোবেন বাইরের ঘরে। কিন্তু শীলা ঘুমের কোনো ব্যাঘাত চান না। তার ভোরেই কাজে যেতে হয় কি না।

অপরেশ কাজ করেন বিকেলের শিফটে রেস্টুরেন্টে। বিকাল পাচটা থেকে কাজ শুরু। শেষ হয় রাত একটা দুইটায়। বাসায় ফিরতে ফিরতে ভোর তিনটে কমপক্ষে। এরপর শুধু এক গ্লাস জল খেয়ে বাইরের ঘরে চুপচাপ শুয়ে পড়েন একা। দীর্ঘশ্বাসে বুকটা ভারী হয়ে আসে। ঘুম আসে না সহজে। ছটফট করেন একা বিছানায়। শীলা এখন প্রচণ্ড বাস্তববাদী। আবেগের ছিটেফোটাও তার ধারেকাছে এখন ভুলেও ঘেষে না। শীলার সঙ্গে

অপরেশের মাসেও একবার সাক্ষাতে কথা বলার সুযোগ হয় কি না সন্দেহ। দুজনেই সপ্তাহের সাত দিনই কাজ করেন।

সকালে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পৌছে দেয়া ও অপরাহ্নে নিয়ে আসার দায়িত্ব অপরেশের। এর মাঝখানের সময়টাতে কিছুক্ষণ ঘুমাতে চেষ্টা করেন। সপ্তাহের বাজার কিংবা লন্ড্র এ সময়টুকুর মধ্যেই সারতে হয়। বিকেলে ছেলেমেয়েদের হোম ওয়ার্ক করতে বসিয়ে দিয়ে তিনি কাজে চলে যান। যেতেই হয়। শীলা ফেরেন আরো দেরিতে। এখানকার আইন অনুযায়ী এই বয়সের ছেলেমেয়েদের একা বাসায় রেখে যাওয়া অপরাধ বা অবহেলা হিসেবে গণ্য করা হয়। তবুও যেতে হয়। কিছুই করার নেই।

শীলার জগৎ এখন শুধুই ডলারের স্বপ্নে বিভোর। দেশের বাড়িতে মা, বাবা, ভাই, বোনের জন্য দামি–দামি উপহার, সোনার গয়না ও ডলার পাঠানোর জন্যে তার অর্জনের সিংহ ভাগ ব্যয় হয়। অবশিষ্টাংশ ব্যয় হয় নিজের অঢেল পোশাক ও অলংকারের জন্যে। সংসার থাকে উপেক্ষিত। ছেলেমেয়েরা পায় না মাকে ছুটির দিনেও। এর নামই নারী স্বাধীনতা। বেগম রোকেয়া কি এ রকম নারী স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন? তাহলে তার স্বপ্ন পুরণ হয়েছে এই দেশে, পাশ্চাত্যে।

এখানে নারীরা এতোই স্বাধীন যে, তাদের কাছে পৃথিবীর সবই মূল্যহীন একমাত্র নিজের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ ছাড়া। প্রাচ্যের নারীদের যন্ত্রণার শোধ হয়তো পাশ্চাত্যের নারীরা নিচ্ছে পুরুষের ওপর। এমন স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনতার কোপে কতো সুন্দর সংসার যে ভেঙে যাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। কতো সুশীল মেয়েও এ দেশে পা রেখেই এতোই উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে যে, স্বামীরা তার কাছে অসহায়। পরিণতি নিশ্চিত ভাঙন। কতোজন আবার জড়িয়ে পড়েছে ভিন্ন সম্পর্কে কিংবা পরকীয়ায়।

অপরেশ একা বিছানায় শুয়ে মাঝে মধ্যে সাত বছর আগের জীবনের অন্য এক শীলার কথা ভাবেন। কল্পনায় সেই মমতাময়ী শীলার ভালোবাসায় আচ্ছন্ন হতে হতে ঘুমোতে চেষ্টা করেন। আজকের শীলার মুখচ্ছবি তার মনেও পড়ে না।

নিউ ইয়র্ক থেকে
dreamcall317@aol.com

সরকারি ভালোবাসা

ডা. কায়সার মামুন

পাঠকরা হয়তো ভাবছেন এ কি রকম কথা? আমিও প্রথমে কিছুটা অবাক হয়েছিলাম।

ঘটনার প্রেক্ষাপট সিংগাপুর। চল্লিশ লাখ লোকের এই ছোট্ট দেশটি আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে স্বাধীন হয়। তখন সরকার ভেবেছিল, জনসংখ্যার চাপে সিংগাপুর ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হবে। তাই নিয়ম করা হয়েছিল, কোনো পরিবার দুটোর বেশি সন্তান নিতে পারবে না। তবে সন্তান একটি হলেই ভালো। কোনো বিবাহিত মহিলা একটি সন্তান নেয়ার পর লাইগেশন করিয়ে সেই সার্টিফিকেট দেখালে তার একমাত্র সন্তানটি ভালো স্কুলে ভর্তি হওয়ার অগ্রাধিকার পেতো।

কিন্তু গত চল্লিশ বছরে সিংগাপুর তৃতীয় বিশ্ব থেকে প্রথম বিশ্বে উঠে এসেছে। মাথাপিছু আয় এখন বৃটেনের চাইতে বেশি।

এক বিখ্যাত আমেরিকান অর্থনীতিবিদ বলেছেন, পুজিবাদ হচ্ছে সবচেয়ে সেরা জন্ম নিরোধক ব্যবস্থা।

এই কথা যে সত্যি তা প্রমাণ করে, দেশটির আয় বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জন্মহার কমে যাচ্ছে। ট্যাক্স ব্রেক বা ট্যাক্স মওকুফ, চাইল্ড কেয়ার সাবসিডি বা সন্তান যত্ন নেয়ার জন্য অনুদান ইত্যাদি দিয়েও জন্মহার বাড়ানো যাচ্ছে না। খরচের কারণে লোকে এখন বিয়ে করতেই নারাজ, জন্মহার বাড়ানো তো পরের কথা।

এই পরিস্থিতিতে এ দেশের সমাজ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় এগিয়ে এসেছে। সরকার এই দেশের সবচেয়ে বড় চাকরিদাতা। তাই সমাজ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় সকল অবিবাহিত সরকারি কর্মীদের উৎসাহ দিচ্ছে সরকারি ডেটিং সার্ভিসে যোগ দিতে। প্রত্যেকে ছবি ও কি ধরনের পাত্র-পাত্রী চাই জানালে এই ম্যাচমেকিং সার্ভিস চেষ্টা করে জুটি মিলিয়ে দেয়ার। জুটির প্রথমে রোমান্টিক ডেট হতে পারে সরকারি খরচে কোনো দামি হোটেলে। এই রোমান্স যদি সফল হয়ে বিয়েতে গড়ায় তাহলে এই জুটি বিশেষ সরকারি সাবসিডি বা অনুদানে অ্যাপার্টমেন্ট কেনার সুযোগ পাবে।

সিংগাপুর থেকে

অপূর্ণতা

– দেবী

বাংলাদেশের লেখিকা তসলিমা নাসরিন সম্প্রতি পশ্চিম বাংলার একটি শারদীয় পত্রিকায় বাঙালি পুরুষের যৌন অজ্ঞতা সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন যা পরবর্তীকালে *যাযাদি*-তে পুনঃপ্রকাশিত হয়। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, বাঙালি পুরুষ নিজেদেরকে যৌন বিশারদ ভাবলেও মডারেট যৌন সম্পর্ক বিষয়ে কিছুই জানে না।

আমি একজন নারী। তারপরও আমার আপত্তিটা তার এ উক্তির ওপরেই যে, *বাঙালি পুরুষ ভালোবাসতে জানে না, শুধু ভোগ করতে জানে।* তিনি হয়তো দুর্ভাগী যে, এমন কোনো বাঙালি পুরুষকে পাননি কি বাংলাদেশে বা কি পশ্চিম বাংলায় তাকে ভালোবেসে তাকে সুখ দিতে চেয়েছেন। তবে এ কথা ঠিক, ভালোবাসা নিতান্তই একটা আত্মিক ব্যাপার যেখানে স্বার্থের কোনো স্থান নেই। তিনি যেসব বাঙালিকে তার শয্যায় পেয়েছেন তারা হয়তো তাকে কখনো ভালোবেসে গ্রহণ করেননি বা করতে পারেননি এ জন্য যে, তিনি সবাইকেই সিড়ি হিসেবে যে ব্যবহার করেছেন এটা ওই সব পুরুষেরা জেনে গিয়েছিলেন। তাই তারা তাদের প্রেম তার ওপর আরোপ করেননি। বাঙালি পুরুষ যে কতোটা আবেগী, কতোটা প্রেমময় হতে পারে এটা তিনি জানেন না। অথচ দেশের লাখ লাখ নারী তা জানে।

একমাত্র কাঙাল পুরুষই এক নারীকে ভালোবেসে কাটিয়ে দেয় আমৃত্যু। তবে আমার লেখার উদ্দেশ্য তাকে কটাক্ষ বা সমালোচনা করা নয়। এ কথা সত্য, যেখানে মানসিক সম্পর্ক না থাকে সেখানে শারীরিক সম্পর্কে কাউকে সুখ দিতে পারে না। আমি এমন অনেককে দেখেছি যারা যৌন ভুবনে অসুখী। তারা তাদের পূর্ণতাটা নানানভাবে প্রকাশ করে এক ধরনের মানসিক শান্তি পাবার চেষ্টা করেন। তাই মানবিক দৃষ্টিতে একে বিকৃত না বলাই ভালো।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এমন দুজনের কথা এখানে বলবো যারা একজন অন্যজনের কষ্টকে পরিপূরক ভেবে স্বস্তি পেতে চেয়েছেন, বিকৃতির মাধ্যমে নয়। এই দুজনার মধ্যকার বন্ধনহীন সম্পর্ক এবং এর পরিণতির মধ্যে যে কার্যকারণ সম্পর্ক তা পাঠক নির্ণয় করবেন।

অর্ণব চারুকলা ইনস্টিটিউট এর ছাত্র। ভীষণভাবে ভালোবাসে ক্লাসমেট সুতপাকে। সুতপাও। সেদিন এক আদিম নারীকে তার ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলার জন্য ভীষণভাবে একজন মডেল খুজছিল অর্ণব। ভয়ে ভয়ে সুপতাকে প্রস্তাবটা দিলে সে সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে যায় অর্ণবকে অবাক করে দিয়ে।

অর্ণব-এর বিস্ময় বুঝতে পেরে সুতপা বলে, তুমি চাইলে আমি দেবো না এমন হয়?

ক্যানভাসের বিষয়ের সঙ্গে অবজেক্ট-এর আত্মিক মিল যে অসাধারণ কিছু সৃষ্টি করবে এটা অর্ণব সব সময়ই উপলব্ধি করেছে তাই সুতপার রাজি হয়ে যাওয়াতে সে আত্মহারা।

এরপর এলো সেই দিন তবে সুতপার শর্ত হলো, তাকে নিরাবরণ করতে হবে অর্ণবকে, সে নিজে কিছুতেই পারবে না।

একটা একটা করে সরে যাচ্ছে সভ্যতার আবরণ। আর ভেতরে ভেতরে কাপছে অর্ণব। তখন ছিল ডিসেম্বর। শীত পড়েছিল বেশ। কিন্তু অর্ণবের আঙুলগুলো অনুভব করছে নিরাবরণ দেহের তীব্র উষ্ণতা। ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে তার কাধে। এক তীব্র আলিঙ্গনে আবিষ্কার করে নিজেকে। অথচ যে তীব্র আবেগের স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার কথা যেখানে সে সাতার দেবে। সেই গভীর স্রোতে খড়কুটোহীন মানুষের মতো যেন ডুবে যাচ্ছিল। অবগাহনের আনন্দ নেই। শুধুই হাবুডুবু খাওয়া। তখন ভীষণ তুচ্ছ মনে হতে লাগলো নিজেকে। রাস্তার পাশে শুয়ে থাকা পঙ্গু ভিক্ষুককেও তখন তার ঈর্ষা হতে লাগলো যে কি না তিন সন্তানের পিতা।

হ্যা, ঠিক বুঝতে পেরেছেন অর্ণব আসলে ইমপোটেন্ট। পুরুষত্বহীনতার বোধ তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় প্রতিনিয়ত। তারপরও সে মানুষ। সে ভালোবাসে সুতপাকে। সুতপা তার নয় এ কথা ভাবতে তার দম বন্ধ হয়ে আসে, চিৎকার করে কাদতে ইচ্ছা করে। প্রেম এমন একটা ব্যাপার, এতটা অধিকার বোধের, এতোটা ঈর্ষার যে প্রেমিকাকে অন্য কারো ভাবতেই সারা শরীরে এক শীতল স্রোত বয়ে যায় তার। প্রতিনিয়ত এই যন্ত্রণা তাকে ক্যান্সারের মতো কুরে কুরে খায়। পাগলের মতো সে খুজে ফেরে একদণ্ড স্বস্তি।

তার এই হতাশ জীবনে একটু স্বস্তি নিয়ে এলো একটি ডায়রি। একজন মানুষ এবং তার জীবনের দুঃখ, বেদনা ও একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতিকে শুধু খুজে পাওয়া যায় তার লেখনিতে। অর্ণব খুজে পায় প্রত্নতত্ত্বের বিলীন এক সভ্যতাকে যাকে অনুধাবনের বা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য আমারও হয়েছিল।

যার কথা বলছি তিনি হলেন রাধা। অর্ণবের বাবার প্রেমিকা। অর্ণবের বাবা মি. দেব তার ছাত্র জীবনে উচ্চ শিক্ষার্থে পাড়ি জমিয়েছিলেন আটলান্টিকের তীরে। সেখানে এক সতীর্থ ইনডিয়ান নারীর প্রেমে পড়েন তিনি। বিদূষী এই নারী তাকে প্রতিনিয়ত বিমোহিত করে যা তিনি অন্য কারো মাঝে খুজে পান না। তবে রাধা ছিলেন নিতান্তই পারিবারিক আবহে বেড়ে ওঠা এক উচ্ছল তরুণী। রাধার সঙ্গে দেব–এর সকল আচরণ তাকে এক অপার বিস্ময়ের জগতে নিয়ে যায়। সে জীবনে প্রথম অনুভব করে প্রেম! প্রেমাশ্রিত ভালোবাসা।

একদিন হালকা আলিঙ্গনে ঠোটে ঠোট রেখে তিনি রাধার ভেতরে জাগান জৈবিক বোধ। এই নারী দেবের হৃদয়ের কতোটা গভীরে ছিলেন জানি না তবে দেব একদিন পারিবারিক প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন রূকমনিকে। এরপরও রাধা পাগলের মতো ভালোবাসতেন দেবকে। তিনি তার শরীরের প্রতিটি ভাজে ভাজে অনুভব করতেন দেবের ছুয়ে যাওয়া স্মৃতি। কি নিবিড় আলিঙ্গন, কি মধুর অধর ছোয়া যা কখনো তাকে ভাসিয়ে নেয় আনন্দ স্রোতে, কখনো অনলবানে।

অথচ বিধাতার কি খেলা বিয়ের পর দেব এমন এক পেশাগত জটিলতায় জড়িয়ে পড়েন যার জন্য দেশে ফেরা তার জন্য দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। রাধার সঙ্গে তার সম্পর্ক একই রকম ছিল তখনো। রাধাই একাধারে তার ফ্রেন্ড, গাইড, ফিলোসফার। বরং এক ধরনের অপরাধ বোধ তাকে রাধার প্রতি আরো দুর্বল করে তোলে। দেব তখন অন্ধের মতো রাধাকে ভালোবাসে। রাধাও দেবকে তার এই দুঃসময় কোনো রকম কষ্ট পেতে দেয় না। মানসিক কষ্ট তো নয়ই, জৈবিকও নয়।

দুজনের মধ্যে তীব্র ভালোবাসা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কখনো চুড়ান্ত শারীরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি দুটো কারণে। এক. দেব ওরাল সেক্স-এ সুখী ছিল আর রাধা সম্পর্কের পবিত্রতায় বিশ্বাসী ছিল। তবুও দেবকে সব রকম শান্তি দেয়ার জন্য রাধার সকল কলঙ্ক তীলক পরতেও দ্বিধা ছিল না। শুধু তার দেব যেন সুখে থাকে। অথচ রাধা চাইলেই যা পারতো তা সে করেনি। প্রতিদিন হৃদয়ের রক্তরক্ষণ নিয়েও রাধা–দেবের সম্পর্ক একই ছিল। রাধাকে না ছুয়ে দেব শান্তি পেতো না। এবং হৃদয়ের সব উষ্ণতা যখন একটু ছুয়ে দেয়ার মধ্যে রক্তিম হয় সেখানে দোষ কি?

পাঠক নিশ্চই ভাবছেন, যে নারী সম্পর্কের পবিত্রতায় বিশ্বাসী তার জন্য এমন কাজ করাটা অনৈতিক কি না। কিন্তু রাধার কাছে এটা তখনো নীতিহীন ছিল না। কারণ তখন তিনি বিশ্বাস করতেন তার দেবকে। কেন জানি না, তার বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, তার দেব তাকে ছাড়া অন্য কাউকে স্পর্শ করেনি, করতে পারে না। কেননা

তিনি তার জীবনে অন্য কোনো পুরুষকে কল্পনাই করতে পারেন না। কিন্তু যখন সেই দিনগুলো এলো দেব প্রতিনিয়ত ফিরে যেতো লাগলো তার দেশে তখন রাধা যেন সংবিৎ ফিরে পেল। দীর্ঘশ্বাসে উচ্চারণ করলো, *ঘরেতে এলো না সে তো মনে যার নিত্য আসা–যাওয়া*। যদিও দেব তার প্রতিটি মেইলেই জানা তো যে, দেশে তার ভালো লাগছে না। তবুও রাধা শান্তি পেতো না। কি ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক ছিল তার সেই রাতগুলো!

এই মানসিক যন্ত্রণা এড়াতে তিনি নিজের হাত, পা বাধতেন। কারণ তিনি বুঝতে পারতেন যে, দুজন নারী–পুরুষের এক ঘরে থাকা আর যেখানে আছে সামাজিক ব্যভিচারের স্বীকৃতি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় প্রেমহীন দাম্পত্য ব্যভিচারের শামিল তাই রাধা এই বিয়ের নাম দিয়েছিলেন সামাজিক ব্যভিচার। তাছাড়া তিনি এও উপলব্ধি করতেন যে, দেব যেহেতু নিজেকে শুদ্ধ প্রমাণের উদ্দেশ্যে রাধার কথা তার স্ত্রীকে বলতে পারবে না সেহেতু নিজের পুরুষত্ব প্রমাণেও পিছপা হবে না। পুরুষের এই মানসিকতার কথা নাসরিন ঠিকই বলেছেন। ফলে রাধা বৃথাই প্রতিদিন প্রার্থনা করতেন রাত যেনো আর না আসে। তার প্রতিটি নিদ্রাহীন রাত প্রেমিক মাত্রই উপলব্ধি করতে পারবেন।

কিন্তু দেবের প্রতি রাধার প্রেম ছিল যতোটা ভালোবাসা ছিল তারচেয়ে অনেক বেশি। তাই তো তিনি এই ভেবে শান্তিও পেতেন যে তার দেব অন্তত নিজের যৌবনের যে চাহিদা Physical needs (শারীরিক চাহিদা) থেকে তো বঞ্চিত হচ্ছে না! কতোটা ভালোবাসলে এমন স্যাক্‌ফাইসিং মেন্টালিটি তৈরি হয় ভাবুন তো? যে সুখ নিজে দিতে পারেনি বা দেবে না কখনো তা অন্যকে দিয়ে পূরণ করার চেষ্টা।

ওদিকে যতোটা জানা যায়, দেব মোটেই সুখে ছিল না। সে নিজেকে পাপী ভেবে প্রতিনিয়ত নিজেকে অভিশাপ দিতো। মন ভাঙা পাপ।

এখন আমার প্রশ্ন আবার মিজ তসলিমা নাসরিনকে, যেখানে ফোর্স ম্যারেজ হয় বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে শুধু ক্ষণিক আবেগে বা ভোগের উদ্দেশ্যে মিলন হয় সেখানে শয্যায় প্রেম আপনি কোথায় খুজে পাবেন বলুন? মূলত এখনো পরিবর্তন হওয়া উচিৎ ভারতবর্ষের পশ্চাদমুখী অভিভাবকদের মানসিকতার। তবেই ইনডিয়ানে পুরুষ প্রেমিক হবে, প্রতারক নয়। আশীর্বাদে পুষ্ট হবে অভিশপ্ত নয়।

যাই হোক, যেখান থেকে শুরু করেছিলাম এই ডায়রিটা। অর্ণবকে ভীষণ নাড়া দিয়ে যায়। সে বোঝে ভালোবাসা কারে কয়? তার বুকে জমে থাকা পাথর গলতে থাকে। সে ভাবে, একজন পূর্ণাঙ্গ স্বাভাবিক মানুষ যখন এমন অপূর্ণতা নিয়ে বাচতে পারে সারা জীবন সেখানে তার নিজের জন্য দুঃখ কোথায়? অর্ণব এখন থেকে রাধাকে মনে মনে সম্বোধন করে *মা*। কারণ মা হবার সাধ তো তিনি কখনো পাননি। মা বলে তাকে হয়তো কেউ ডাকবে না। কিন্তু সে ডাকবে। কারণ একমাত্র অপূর্ণজনই জানে অপূর্ণতার কি কষ্ট!

ঠিকানা বিহীন

megh_0324@yahoo.com

আশাবাদী

– ইয়াসমিন

আমি চ্যাট করতে একদম পছন্দ করি না। আমার ধারণা, চ্যাট করতে বসে শতকরা নিরানব্বই ভাগ মানুষ নানান রকম গল্প বানায়। কিন্তু একদিন সাইবার ক্যাফে বসে কিছু ওয়েবসাইট ব্রাউজ করছি তখন দেখি একজন আমার ইয়াহু মেসেঞ্জারে বন্ধু হিসেবে অ্যাড হতে চাচ্ছে। *ইয়াহু*–র সমস্যা হচ্ছে কাউকে অ্যাড করতে না চাইলে তাকে থ্যাংকস বাট নো থ্যাংকস জাতীয় বাণীই মেল করতে হয়।

কাউকে এরূপ মুখের ওপর প্রত্যাখান করা আমার খুব রূঢ় লাগে। কাজেই অ্যাড করলেও আমি সাড়া–শব্দ একটু বাড়াবাড়ি রকমের কম করি। সে রকম এই মানুষটিকেও অ্যাড করেছিলাম। কিন্তু এই বান্দা অন্যদের মতো নয়। আমি কথা না বলতে চাইলেও বলিয়ে ছাড়বে। ভীষণ নাছোড়বান্দা।

যাকগে, আমাদের কথাবার্তা শুরু হলো। আর এভাবেই আমার বন্ধু ওশান রজার–এর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। সপ্তাহ ঘুরতেই আমরা ভালো ফ্রেন্ড হয়ে গেলাম। রজারের সেন্স অফ হিউমার এবং গল্পের অভিনবত্বের কারণে তার মেল পড়তে খুবই ভালো লাগতো। মাস দুয়েক ভালোই কথাবার্তা হচ্ছিল। হঠাৎ রজার ডুব দিল। একেবারে নিখোজ।

তারপর লেখা শুরু করলো। কি কারণে এতোদিন সে ডুব মেরেছিল তা জিজ্ঞাসা করলে কোনোমতেই প্রথমে বলে না। শেষে অনেক খোচাখুচির পর জানলাম, রজারের ক্যান্সার হয়েছে। মাঝে মধ্যেই সে জন্য তাকে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে কোমোথেরাপি নিতে হয়।

ডাক্তারদের ভাষ্যমতে, বেশি হলে আর দুই বছর সে বাচবে।

ছাব্বিশ বছরের একটি তরতাজা মানুষ নিজের ভেতর বিষবৃক্ষ পুরে রেখে দিনের পর দিন আমাকে কতো গল্প বলে হাসিয়েছে। বুশকে দেখতে পারে না বলে বুশের কতো রকম ইলাসট্রেশন, জোকস আমাকে পাঠিয়েছে।

আমার একজন না দেখা অজানা মানুষের জন্য ভীষণ কষ্ট লাগতে লাগলো। আমি দুঃখে এতোই পাথর হয়ে গিয়েছিলাম যে, রজারকে কোনো মেল পর্যন্ত করতে পারিনি।

রজার ঠিকই বুঝতে পেরেছিল। রজার আমাকে লিখেছিল, সে আজো আশা করে, কোনো মিরাকলের জোরে সে ভালো হয়ে যাবে। তাই প্রতিটি দিনের জন্য সে বাচে। প্রতিটি দিন সে মিরাকলের জন্য অপেক্ষা করে। নামের কারণে কি না কে জানে, রজারের যাবতীয় কাণ্ডকারখানা সমুদ্র আর তার বিচিত্র সব প্রাণী নিয়ে।

রজার আমাকে একটি মেলে লিখেছিল, আমি প্রাণ দিয়ে এই সমুদ্রকে ভালোবাসি। আমার জীবন সময়, শ্রম সব এই সমুদ্রকে দিয়েছি। সমুদ্র আমার ভালোবাসার প্রতিদান দেবে না তা কি হয়? কাজেই মিরাকল হবেই। আমি ভালো হবোই এবং একশ বিশ বছর কচ্ছপের মতো বেচে থাকবো।

রজার তার বিশ্বাস কোথা থেকে পায় কে জানে। শুধু প্রতিদিন তার জন্য আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করতাম যাতে সে ভালো হয়ে যায়, যাতে সে একশ বিশ বছর বাচে, যাতে সে বাংলাদেশে বেড়াতে আসতে পারে, যাতে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়।

মাস তিনেক আগে রজার আমাকে শেষবারের মতো মেল করে। রজার বলে, সে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একটা দ্বীপে চলে যাচ্ছে। সেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব ভালো নয়। বেশ অনুন্নত দ্বীপ। আর সে কারণে দ্বীপটির পরিবেশ এবং তাতে ঘিরে থাকা সামুদ্রিক পরিবেশ অনেকটাই পরিচ্ছন্ন, দূষণমুক্ত। প্রতিদিন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে সে রাজি নয়। সে যদি সবার মাঝে শহরে থাকে তবে কেউ তাকে ভুলতে দেবে না, সে মরে যেতে পারে যে কোনোদিন। তার মৃত্যুর পরোয়ানা জারি হয়ে গেছে। সে এখনো বিশ্বাস করে মিরাকল হবেই। সে ভালো হবেই। সেই মিরাকলের আশায় জনপদ ফেলে প্রায় জনহীন প্রকৃতির মাঝে সে থাকতে চলে যাচ্ছে।

এটাই আমাকে লেখা তার শেষ চিঠি। যদি সে ভালো হয়ে যায় তবে সে আবার মানুষের মধ্যে ফিরে আসবে, আবার তখন সে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

আমি সেদিন থেকে রজারের মিরাকল ঘটার অপেক্ষায় আছি।

উত্তরা, ঢাকা থেকে

এই ভালোবাসা সেই ভালোবাসা না

– বয়

পৌরনীতি ম্যাডাম ক্লাসে ঢুকেই বললেন, তোমাদের একটি মজার গল্প শোনাই।

আমরা সবাই খুব আনন্দের সঙ্গে ম্যাডামের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

ম্যাডাম বললেন, *একটু আগে প্রক্সি নিতে গিয়েছিলাম ক্লাস ওয়ানে। হঠাৎ একটি মেয়ে কান্না কান্না ভাব নিয়ে এসে আমাকে বললো, ম্যাডাম, ওই ছেলেটা আমাকে বলেছে, সে আমাকে ভালোবাসে। এই কথা বলামাত্রই সে কান্নায় ভেঙে পড়লো। আমি তো আশ্চর্য হয়ে গেলাম। মেয়েটিকে কি বলবো! অবশেষে বললাম, তাতে সমস্যা কি? আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমার আব্বা তোমাকে ভালোবাসে ঠিক তেমনি ও তোমাকে ভালোবাসে। তাই না?*

হঠাৎ তার সঙ্গে একটি ছেলে বললো, ম্যাডাম এই ভালোবাসা সেই ভালোবাসা না!

ম্যাডাম গল্প শেষ করলেন আর আমরা হাসতে লাগলাম। বেশ কিছু দিন আমাদের ক্লাসে এই ডায়ালগ জনপ্রিয়তা পায়।

ময়মনসিংহ থেকে
watting_4_rain@yahoo.com

দুর্ভাগা

– ফরহাদ হোসেন

রাস্তার দুপাশে হলুদ বাতি জ্বলছে। ধীরে ধীরে রিকশা, গাড়ি এবং পায়ে হাটা মানুষের চলাচলও কমছে। রাস্তা ফাকা হয়ে যাচ্ছে। সবাই ঘরে ফিরছে। ফিরবে না কেন? সবাই কি আমার মতো বোকা নাকি যে, এ যুগেও মজনু সেজে ভালোবাসার পরীক্ষা দেয়ার জন্য সারা রাত ইডেন মহিলা কলেজের হল গেটে বসে থাকার যে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বোকা ছাড়া আর কি হতে পারে।

রাত এগারোটা, শুধু ঘড়ি দেখি। সময়কে যেন কেউ পেছন থেকে ধরে রেখেছে। কোনোভাবেই যেন সময় সামনের দিকে যেতে পারছে না। আশপাশের ফ্ল্যাটের লাইট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে, তাদের ক্লান্তিময় দেহখানা বিছনার কোলে এলিয়ে দিচ্ছে।

খুব চা-এর তেষ্টা পেয়েছে। কিন্তু কোনো উপায় নেই, মামা তো সেই নয়টার সময় চায়ের দোকান বন্ধ করে দিয়েছে। ধূমপানের অভ্যেস থাকলে মনে হয় ভালোই হতো। চোখ আমার কথা শুনছে না। হালকা ঝিমুনি চলে আসছে।

বেশ মোটা একটা মেহগনি বৃক্ষের নিচে ফুটপাথে এক টুকরা কাগজের ওপর বসে আছি। মাথার ওপর বিশাল আকাশ। পায়ের নিচে বিস্তৃত জমিন। মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে নাকি আছে, *জীবন শুরুতে যাদের বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ কম থাকে, পরবর্তী জীবনে সেই আকর্ষণ কয়েকগুণ বেড়ে যায়।*

তীব্র একটা দুর্গন্ধ নাসিকার দ্বার-প্রান্তে কড়া নাড়লো। পাশ ঘুরে দেখি ডাস্টবিনে কুকুর চার পাসহ মুখ দিয়ে যেন তার হারানো জিনিস খুজছে।

নাইটগার্ডের বাশির আওয়াজে বড় বড় চোখ করে নড়েচড়ে বসলাম। রাত এখন বারোটা। ইতিমধ্যে মশার সবচেয়ে প্রিয় খাদ্যবস্তু হয়ে গেছি। আমার বিশ্বাস, সেদিন হয়তো মশারা ডাক্তার হয়ে আমার শরীর থেকে প্রায় আধা পোয়া রক্ত বের করে নিয়েছে। হঠাৎ দেখি রাস্তার মাঝখান দিয়ে হেটে যাচ্ছে চুল-দাড়ি লম্বা বস্ত্রহীন এক বাদশাহ।

আমিও পাশ থেকে একটা আধলা ইটের টুকরা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছি।

সে দেখে ভাবলো, এ মনে হয় আমার চেয়ে বড় পাগল। সোজা নীলক্ষেতের দিকে হেটে গেল।

এই গভীর রাতে ছিনতাইকারী আসতে পারে। তাই ঘড়ি, চশমা, মানিব্যাগ ইটের নিচে লুকিয়ে রাখলাম। রাত তখন একটা। খুব দ্রুত গতিতে একটি ট্রাক ধুলাবালি উড়িয়ে আজিমপুরের দিকে ছুটে গেল। তার আলোয় দেখতে পেলাম আজিমপুর চৌরাস্তা মোড় থেকে তিনজন পুলিশ এদিকে আসছে। চিন্তা করলাম দুর্গন্ধ, কুকুর, মশা, পাগল, ছিনতাইকারী এবং ধুলাবালির হাত থেকে রক্ষা পেলেও পুলিশমামার হাত থেকে রক্ষা নেই। নির্ঘাত বিপদ। ভেবে-চিন্তে ফুটপাথের ওপর শুয়ে পড়লাম।

পুলিশ ভাবলো, হয়তো কোনো পাগল-টাগল ঘুমিয়ে আছে। তাই তারা আমাকে কোনো রকম ডিস্টার্ব না করে সামনের দিকে চলে গেল।

রাত তখন সোয়া দুইটা। সেদিন ফুটপাথে শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখিনি। তবে কেন আজকের রাতে আমি ফুটপাথে?

ছোটকালে খুব লাজুক স্বভাবের ছিলাম। বিশেষ করে মেয়েদের সামনে, হোক সে বড় কিংবা সমবয়সী। আর অপরিচিত হলে তো কথাই নেই। বাড়ির পুকুরে কিংবা কলে যদি কোনো মেয়ে আসতো, আমি তখন ঘর থেকে বের হতাম না।

একদিন গোসল করার পর কাপড় বদলানোর সময় পানি নিতে আসা এক পড়শি ভাবী তো মজা করে বললেন, আমি সব দেখে ফেলেছি। শোনামাত্রই গুমরে কাদতে শুরু করেছি। যতোক্ষণ না পর্যন্ত সে ভাবী বললো, আমি মজা করেছি, কিছুই দেখিনি, ততোক্ষণ পর্যন্ত কেদেছিলাম।

স্কুলের মেয়েরা আমার এই দুর্বলতা জানত। তারা মাঝে মধ্যে আমাকে নিয়ে মজা করতো আর আমি চুপ করে পেছনের বেঞ্চে বসে থাকতাম।

ক্লাসের সবাই আমাকে *মেয়ে ভীরু* বলে ডাকতো।

একটা শয়তান মেয়ে ছিল ক্লাস চলাকালে সে ঘাড় ঘুরিয়ে উপরের দাত দিয়ে নিচের ঠোট কামড়ে ধরে চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকাতো।

আমি বেশ ভয় পেয়ে যেতাম।

এসএসসি পরীক্ষার পর আমার এই মানসিক রোগটা ধীরে ধীরে ভালো হতে থাকে। তারপরও আশপাশে বয়েজ কলেজ না পাওয়ায় থানা শহরের কলেজে ভর্তি হলাম।

আমার কলেজ জীবনে কোনো মেয়ে বান্ধবী ছিল না। কোনো মেয়ের সঙ্গে কথাও বলতাম না। তবে দূর থেকে মেয়েদের দেখতে ভালো লাগত। কিন্তু কাছে গিয়ে কথা বলতে পারতাম না।

এইচএসসি পাশের পর ইউনিভার্সিটির জন্য ঢাকায় কোচিং শুরু করলাম। কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে চান্স না পেয়ে ঢাকা কলেজে ভর্তি হলাম। ঢাকা কলেজে ভর্তি হওয়ার পেছনে একমাত্র কারণ ছিল এটা সম্পূর্ণ বয়েজ কলেজ, তাই। এখানে কোনো মেয়ে নেই। ফলে স্বাধীনভাবে ক্লাস করছি। মন দিয়ে লেখাপড়া করছি। এমনি করে দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়।

২০০৩-এ ঈদুল ফিতরের ছুটি কাটিয়ে বাড়ি থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে *ঈগল* পরিবহন কাউন্টার থেকে দিনের কোচে টিকিট কাটলাম। সকলেই ঈদের ছুটি কাটিয়ে ঢাকায় ফিরছে। তাই কাউন্টারে তিল ঠাইয়ের জায়গা নেই এ কথা বলবো না। তবে বসার জন্য একটি জায়গাই খালি আছে। তাও আবার একটি মেয়ের পাশে।

কাউন্টারে গাড়ির জন্য অপেক্ষায় বিরক্তির যন্ত্রণা মেয়েটির চোখে মুখে ফুটে উঠেছে।

তার পাশে না বসে, বরং বাইরে দাড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পর একটি পরিবহন কাউন্টারের সামনে এসে দাড়ালো। কাউন্টার থেকে আওয়াজ এলো, চেয়ার কোচের যাত্রীবৃন্দ দয়া করে সামনে অপেক্ষমাণ পরিবহনে আপনাদের নিজ নিজ আসন গ্রহণ করুন। আপনাদের যাত্রা শুভ হোক।

কাউন্টার থেকে ভেসে আসা কথাগুলো আমার জন্য খুশির সংবাদ না হলেও কাউন্টারে অপেক্ষমাণ অধিকাংশ যাত্রীর জন্য খুশির সংবাদ ছিল। কারণ অধিকাংশ যাত্রী ছিল চেয়ার কোচের। আমিসহ বাকি কয়েকজন মাত্র *নরমাল* কোচের যাত্রী। তাই শুরু হলো আমাদের অপেক্ষার পালা। দেখলাম বিরক্তিভাব নিয়ে কাউন্টারে বসে থাকা মেয়েটাই আগে পরিবহনে উঠলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে যাত্রী নিয়ে পরিবহনটি অতীত রেখে ভবিষ্যতের দিকে ছুটে গেল। প্রায় দশ মিনিট পর একটি নরমাল কোচও আমাদের নিয়ে সামনের দিকে ছুটে চললো।

পদ্মায় ফেরি পার হওয়ার জন্য পরিবহনের সারি দেখে মনে হয় যেন দৌলতদিয়া ঘাটে পরিবহন দিয়ে রেলগাড়ি হয়েছে।

দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর ফেরিতে উঠলাম। ফেরির বাথরুম থেকে ফেরার সময় মহিলা বাথরুমের সামনে সিরিয়ালে দাড়িয়ে থাকা কাউন্টারে সেই বিরক্তিভাব নিয়ে বসে থাকা মেয়েটিকে দেখলাম। বুঝতে বাকি রইলো না যে, তাদের গাড়ি এবং আমাদের গাড়ি একই ফেরিতে।

বিকেলবেলা গাবতলী নেমে সাত নাম্বার বাসে উঠে ড্রাইভারের পাশে মহিলা আসনে বসা আবারও সেই মেয়েটিকে দেখলাম। এবার কিছুটা অবাক হলাম। সাত নাম্বার বাস, বাসস্ট্যান্ড থেকে লঞ্চঘাট অর্থাৎ গাবতলী থেকে সদরঘাট পর্যন্ত এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। চিন্তা করছি মেয়েটি কোথায় নামতে পারে।

এক সময় চিন্তার অবসান ঘটিয়ে মেয়েটি নামলো ইডেন কলেজ।

ভাবলাম মেয়েটি নিশ্চয় ইডেন কলেজ তথা আবাসিক হলের ছাত্রী। ততোক্ষণে বাস আমার গন্তব্য স্থান আজিমপুরে চলে এসেছে।

মেসে ফিরে রুমমেটদের সামনে মেয়েটির কথা বললাম।

তারা বললো, তোমার ভাগ্য বটে!

যাই হোক। বেশ কিছু দিন পর নীলক্ষেত নিউ কুমিল্লা বুক হাউজে খণ্ডকালীন যাত্রাপথের সঙ্গী সেই মেয়েটির সাথে আবার দেখা।

অবশেষে প্রায় ছয় মাস পর ঢাকা কলেজের বিপরীতে অবস্থিত *আলফা একাডেমি কোচিং সেন্টার*–এর সিড়ি ঘরে প্রায় ভুলে যাওয়া গত দিনের আশ্চর্য হওয়ার ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দিল একটি মুখ। আবারও সেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা।

কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে মেয়েটি প্রথম বললো, আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি।

জড়তা দূর করে সাহস নিয়ে বললাম, কোথায় নয়, কোথাও কোথাও।

ঠিক বুঝলাম না আপনার কথা।

এই যেমন প্রথম ঈদের পর পাইকগাছা ঈগল পরিবহন কাউন্টারে, দ্বিতীয় পদ্মায় ফেরি পারাপারে, তৃতীয় গাবতলী সাত নাম্বার বাসে, চতুর্থ নীলক্ষেত নিউ কুমিল্লা বুক হাউজে এবং বহু দিন পর পঞ্চম বারের মতো আলফা একাডেমি কোচিং সেন্টারে দেখা হলো।

যতোদূর সম্ভব মনে পড়ে, এই পচিশ বছরে কোনো মেয়ের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ ধরে কথা বলা।

কিন্তু পাঠক, এবার শুধু আপনারা নয়, পৃথিবীর সমস্ত জড়বস্তুও পর্যন্ত আশ্চর্য হবে শুনে যে, দুজনে সমাজবিজ্ঞান সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি এবং ইংরেজি পড়ার উদ্দেশ্যেই কোচিং সেন্টারে আসা।

মেয়েটির সঙ্গে সেখান থেকে নিয়মিত দেখা হয়, কথা হয়। ধীরে ধীরে মেয়েটিকে আমার ভালো লাগতে শুরু করে এবং এক পর্যায়ে তাকে ভালোবেসে ফেলি।

মেয়েটি দেখতে সুন্দরী কি না জানি না। তবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হৈমন্তীর মতোই দেখতে মেয়েটি। তাছাড়া এক কথায় বলবো যে, পৃথিবীতে এসেছি পচিশ বছর, তার ভেতরে ঢাকায় আছি পাচ বছর। কিন্তু এতো সুন্দর মেয়ে এখনো পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি।

তাকে প্রচণ্ড রকম ভালোবেসে ফেললাম। একটি উদাহরণ দিলে বুঝবেন।

একদিন নিউ মার্কেটের দিক থেকে দ্রুত গতিতে রিকশায় মেয়েটিকে ইডেন কলেজের দিকে যেতে দেখলাম। পথিমধ্যে হোম ইকনমিক্স কলেজের সামনে তাকে এক পলক দেখতে পেয়ে রিকশার পেছনে ফুটপাথ দিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে হল গেট পর্যন্ত গিয়েছিলাম। দূর্ভাগ্যবশত সেদিন তাকে ধরতে পারিনি।

ভালোবাসার আগুনের মশাল জ্বলছে বুকের ভেতর। সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার আগে আমার ভালোবাসার কথা এক সময়ে তাকে জানালাম।

কিন্তু সে আমার ভালোবাসা গ্রহণ করলো না। দিনের পর দিন সে আমার ভালোবাসা ফিরিয়ে দিতে লাগলো। তার স্পষ্ট কথা, প্রেম ভালোবাসা ছাড়া যে কোনো ভালো সম্পর্ক সে আমার সঙ্গে রাখতে চায়। কিন্তু কেন সে আমাকে ভালোবাসে না এ কথা কোনোদিন বলেনি।

আমিও নাছোড়বান্দা। যে কোনো উপায়ে তার ভালোবাসা পেতে চাই।

খুব বেশি দিন আগের কথা নয়। এক সন্ধ্যায় ইডেন কলেজের হল গেটে বসে দুজন কথা বলছি। কথার এক পর্যায়ে বললাম, তোমার জন্য সব কিছু করতে পারি। তোমার ভালোবাসা পাওয়ার জন্য নিজের সুখ পর্যন্ত হারাম করতে পারি।

মেয়েটি ইয়ার্কি করে বললো, আমার জন্য সারা রাত এখানে বসে থাকতে পারবে।

পারবো কি না জানি না। তবে চেষ্টা করবো। কথা বলতে বলতে রাত প্রায় নয়টায় সব মেয়েরা হলের ভেতর ঢুকছে। কারণ নয়টায় হল গেট বন্ধ হয়ে যায়।

তুমি এখন যাও আমি হলে ঢুকবো।

বললাম যাবো তবে এখন নয়, সকালে।

বলো কি, তুমি কি সত্যি সত্যিই সারা রাত এখানে থাকবে।

তবে আর বলছি কি। আচ্ছা, আমি না হয় বিশ্বাস করলাম তুমি পারো এখন যাও।

কোনো কথা বলছি না।

তুমি উঠবে কি না বলো? কে শোনে কার কথা। চুপচাপ বসে আছি। অবশেষে আমাকে ওঠাতে না পেরে গেট বন্ধ হওয়ার ভয়ে মেয়েটি হলে চলে গেল। একে একে ছেলেমেয়েরা সবাই চলে গেল। বসে রইলাম আমি একা।

চারদিক থেকে ফজরের আজান ভেসে আসছে। ঢাকা সিটি কর্পরেশনের পরিচ্ছন্ন কর্মীরা রাস্তা পরিষ্কার করছে। হাই তুলে দুই হাত টান টান করে একটা আলস্য ছেড়ে উঠে বসলাম।

কাকডাকা ভোরে মেয়েটি এলো।

বুঝলাম তারো হয়তো ভালো ঘুম হয়নি।

মেয়েটি এসে বললো গোসল করে ঘুম দিয়ে বিকেলে আসবে। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

শরীর এতোটা খারাপ লাগছিল যে তার সঙ্গে কথা না বলে সোজা চলে গেলাম।

বিকেলে বুক ভরা আশা নিয়ে যথাসময়ে তার সঙ্গে দেখা করলাম।

মেয়েটি ভূমিকা ছাড়াই শুরু করলো। আমি যে কথাগুলো তোমাকে বলব আবেগকে প্রশ্রয় না দিয়ে বাস্তবতার মাপকাঠিতে বিচার বিশ্লেষণ করবে। তোমার মতো ছেলেকে শুধু আমি কেন, যে কোনো মেয়ে ভালোবেসে সুখী হবে। তোমার ভালোবাসা পেলে যে কোনো মেয়ের জীবন ধন্য হবে। কিন্তু তুমি আসার অনেক আগে আমি অন্য একটি ছেলেকে ভালোবেসেছি। না হলে তোমাকে ভালোবেসে নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্যবতী মেয়ে ভেবে ধন্য হতাম।

মেয়েটি কথাগুলো এক নাগাড়ে বলে মাথা নিচু করে বসে রইলো।

ততোক্ষণে সব কিছু বুঝতে আমার আর বাকি রইলো না।

মনকে শক্ত করে চোখের পানি চেপে বললাম, তোমার ভালোবাসাকে এবং সেই সৌভাগ্যবান পুরুষকে শ্রদ্ধা জানাই। তার প্রতি তোমার ভালোবাসা আরো গভীর হোক। আমার চেয়ে ওই সৌভাগ্যবান পুরুষটি যেন তোমাকে আরো বেশি ভালোবাসে এ কামনাই করি। বিয়ের পর মূহূর্ত পর্যন্তও যদি ওই সৌভাগ্যবান পুরুষের কাছ থেকে যদি কোনোদিন কোনো কারণে এতোটুকু দুঃখ পাও তবে এসো, সেদিনও তোমায় ফেরাবো না। তোমার অপেক্ষায় থাকবো না, এতে যদি তোমার অমঙ্গল হয়। তাই যদি কোনোদিন আমাকে প্রয়োজন হয়, ডেকো। ধরনির যে প্রান্তে থাকি, তোমার ডাকে সাড়া দেবো। আমার জন্য আশির্বাদ করতে না পারো, অভিশাপ দিও না।

চোখের পানি গড়িয়ে পড়ার আগেই চলে গেলাম।

লালবাগ, ঢাকা থেকে
farhadhbd@yahoo.com

মহামেডান

– মুহাম্মদ জাহির

ভালোবাসা ও যৌনতার সংজ্ঞা দুইটি আমার কাছে ভিন্ন ধরনের। শুধু যৌনতা দিয়ে আকর্ষণ কমানো–বাড়ানো যায়। অপরদিকে ভালোবাসা দিয়ে কাউকে ধরে রাখা যায় না। মনের মাঝে তখনই দাগ কাটবে যখন ভালোবাসা ও যৌনতা এক সঙ্গে প্রয়োগ করা যাবে। জুলির সঙ্গে ছিল শুধু যৌন সম্পর্ক। কাছে টেনে আনা, বিছানায় যাওয়া, পোশাক ঠিক করে বাইরে আসা। জুলির বিয়ে হয়ে গেল, সমস্ত আকর্ষণ হারিয়ে গেল।

মিতাকে ভালোবাসি। যৌন সম্পর্ক কেবল স্বপ্নে। তাই মাঝে মধ্যে আবেগ বাড়ে আবার যথাস্থানে চলে আসে। কিন্তু মিতুর সঙ্গে আছে ভালোবাসা ও যৌনতা। তাই আকর্ষণ কমার কোনো পথ খোলা নেই। এ আকর্ষণ তখনই বিকর্ষণের রূপ নেবে যদি থাকে পারিবারিক বা সামাজিক বাধা। আমি মুসলিম, মিতু হিন্দু মেয়ে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হলাম। হস্টেল পাওয়া যায় এক বছর পরে। বাসস্থান হিসেবে বেছে নিলাম কবি কুমার বসুর বাড়ি। তার মা ববি বসু। তাদেরকে দাদা ও মাসি বলে ডাকতাম। মাসিরও লেখালেখির অভ্যাস ছিল। বাড়িটি আছে দমদম এয়ারপোর্টের আড়াই নাম্বার গেটে। দমদম এয়ারপোর্টের গেটগুলোর নাম বেশ মজার – এক নাম্বার গেট, দুই নাম্বার গেট, আড়াই নাম্বার গেট, পনে তিন নাম্বার গেট ও তিন নাম্বার গেট। বাংলাদেশি ছাত্রদের স্বর্গ ছিল কুমারদার বাড়িটি। মমিনভাই বাংলাদেশি ছাত্র। কুমারদার বাড়িতে ভাড়া থাকতো পড়তো আইন নিয়ে।

আমরা তিনজন মমিনভাইয়ের সঙ্গে থাকতাম। কষ্ট হয়। তাই নতুন বাড়ির খোজ শুরু হলো। মুসলিম হওয়ার কারণে কেউ বাড়ি ভাড়া দেয় না। অবশেষে বিজন চৌধুরীর বাড়িতে স্থান হলো মনি, কাবিল ও আমার। মনি আবিষ্কার করলো এই বাড়িতে বিজন চৌধুরীর মেজ ছেলের একটি মাত্র সন্তান স্মিতা চৌধুরীকে। প্রথমে মনির ইচ্ছা ছিল, পরে আমার হয়ে স্মিতাক প্রস্তাব দেয়। মনি কিছু দিন চেষ্টা করেছিল যেন আমার সাথে স্মিতার প্রেম হয়।

মনি আশা ছেড়ে দিলে আমি নেমে পড়লাম যুদ্ধের ময়দানে। আবার ফিরে গেলাম কবি কুমার বসুর বাড়িতে। কারণ দাদা নাগের বাজারে ফ্ল্যাট কিনেছেন। আমি দাদার ঘরে থাকতাম। বিশ্বদাস চৌধুরীর বাড়ি ছেড়ে দেয়া ও কুমারদার বাড়িতে ফিরে আসার মাঝখানের সময়টুকুতে ছিলাম এডভোকেট সুরি গুপ্তর বাড়িতে। বাড়িটি আছে মিতুদের বাড়ির পাচ–ছয়টি বাড়ির পেছনে। মিতু প্রায়ই আমার বাসস্থানের সামনে দিয়ে জেঠার বাড়িতে যেতো।

মিতুকে একদিন ডেকে এনে আমার ঘরে এনে চুমু দিয়ে ছেড়ে দিলাম। তার কিছু দিন পর মিতু আই লাভ ইউ বলতে এলো। সব কিছু দেয়া–নেয়া হয়ে গেল। কিছুই বাকি রইলো না।

সুরিদা সিপিআই দল করে। আমি সুরিদার সঙ্গে বিভিন্ন সবাবেশ, মিটিং, সেবামূলক কাজকর্ম করতাম।

তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ছিল কটলাদা। তার সঙ্গে ছিল আমার গভীর বন্ধুত্ব। কুমারদা সিপিএস দল করে। মোট কথা, প্রতিটি রাজনৈতিক দলে আমার বিচরণ ছিল। এজন্য বিধান সভা ও রাজ্যসভার নির্বাচন, এলাকায় কমিটি গঠন, পূজার কমিটি, রক্তদান কর্মসূচি ইত্যাদি কাজকর্মে আমার থাকা চাই। এই পাড়ার কাউকে কাকিমা, বউদি, কাকু, দাদা বলে ডাকতাম। পাড়ার অধিকাংশ জনগণ আমাকে চিনতো।

মিতুর জেঠিমা আমাকে ধর্মছেলে বানিয়েছিলেন। যদিও তার দুইটি ছেলে আছে। অবশ্য আমি তার যথেষ্ট সেবা করেছিলাম যখন তার মেরুদণ্ডে অপারেশন হয়েছিল।

ববি বসু তো আমাকে নিজের ছেলে বলে পরিচয় দিতেন। কুমারদা নাগের বাজারে চলে যাওয়ার পর মাসির সমস্ত দায়িত্ব ছিল আমার ওপরে। মাসিকে বই মেলায়, কবিতা উৎসবে, ব্যাংকে নিয়ে যাওয়া–আসা আমার দায়িত্ব ছিল। তাছাড়া ছোটখাটো কাজ যেমন টেলিফোন বিল, ইলেকট্রক বিল, বাড়ির ট্যাক্স জমা দেয়া।

এক সময় ভুলেই গিয়েছিলাম আমি বাংলাদেশি মহামেডান। এলাকার মানুষ আমার বন্ধুদেরকে বাংলাদেশি মহামেডান ভাবলেও আমাকে ভাবতো না।

কলকাতার হিন্দুরা মুসলিমকে *মহামেডান* বলে ডাকে। মিতুকে নিয়ে বিভিন্ন পার্ক, মেলা, সিনেমা হলে যেতাম, প্রায় প্রতিদিনই আমার ঘরে নিয়ে আসতাম। এলাকার মানুষ শুধু চেয়ে থাকতো কেউ কিছু বলতো না। না বলার পেছনে দুইটি কারণ ছিল। *এক.* মিতুর জেঠিমার আমি ধর্মছেলে। জেঠিমা কিছু দিন সুরিদার পাশের বাড়িতে ভাড়া ছিলেন, পরে নিজের বাড়িতে ফিরে যান। জেঠি আছে দ্বিতীয় তলায়, মিতুর পরিবার নিচ তলায়। তাই সপ্তাহের ছয় দিনেই জেঠিমার ঘরে স্নান, খাওয়া–দাওয়া, ঘুমানো, টিভিতে আনন্দ উপভোগ করা হতো। হাজার হোক আমি এই বাড়ির ছেলে ছিলাম।

দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে, আমি বিভিন্ন নেতাদের সঙ্গে চলাফেরা করতাম। সমাজে আমার একটি অবস্থান ছিল। তাই এলাকার মানুষ সন্দেহ করলেও মুখ খুলতো না। মিতুর বাবা–মা, বাড়ির লোক, আত্মীয়স্বজন সন্দেহ করতো না যেহেতু মিতু আমাকে ভাইফোটা দিতো।

এভাবে কেটে গেল তিন বছর এর মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক হয়েছিল প্রায় প্রতিদিন। অবশ্য আমার থেকে মিতুর দৈহিক সম্পর্কে আগ্রহ ছিল বেশি। আমি মিতুর সুখটাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলাম। মিতুকে জাগাতে জাগাতে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতাম, ওর চোখে জল চলে আসতো আর বলতো, প্লিজ আমি আর পারি না। তারপর আমি ওর ভিতরে প্রবেশ করতাম। পুরো আনন্দ ভোগ করে নিভে যেতো। তখনো আমি জ্বলে থাকতাম। এভাবেই চলতো আমাদের সেক্স।

বাংলাদেশি ছাত্ররা মিতুকে মেনে নিয়েছিল। আমাদের মাঝে ঝগড়া হলে সব ছাত্ররা মিলে আমার বিচার করতো। শুধু এরা কেন, বাংলাদেশ থেকে আমার ও বন্ধুদের বাবা–মা, আত্মীয় স্বজন কলকাতায় বেড়াতে যেতেন। মিতুর সঙ্গে পরিচয় হতো। তারা কতো ধরনের উপদেশ ও উপহার দিতেন, যেগুলো মিতু মেনে চলার চেষ্টা করত। আমার মা তো নিজ কানের দুল খুলে মিতুকে দিয়েছিল।

আমার ফাইনাল পরীক্ষা শেষ, রেজাল্ট হাতে পেয়েছি। স্পেনে যাবো উচ্চতর ডিগ্রি নিতে। স্প্যানিশ ভাষার ওপর যথেষ্ট দখল এসেছে। কলকাতা টু মাদৃদ টিকেট করেছি। শেষবারের মতো জেঠিমার ঘরে চুমু খাওয়ার পর্ব চলছে। বেশি দূর যাওয়া যাবে না। মিতুর মাসিক ক্রিয়া চলছে। তবে ওরাল সেক্সে বাধা নেই। জানালা দিয়ে দেখে ফেললো মিতুর জেঠার ছেলে ও পিসির ছেলে। দুজনেই মিতুর সমবয়স্ক।

এরপর জেঠার ছেলে দিরাই দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে বলছে, *তুমি চলে যাও, আমি মিতুর সঙ্গে সেক্স করবো।*

তখন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। সত্যিই দিরাই মিতুর স্তনে হাত দিয়ে ফেলেছিল। মিতু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সরিয়ে নিচ তলায় নেমে গিয়েছিল।

তখন হিন্দু ধর্মের ওপর প্রচণ্ড রাগ হলো। হিন্দুরা কতো কথা আমাকে বলেছিল। মহামেডানদের মধ্যে চাচাতো, মামাতো, ফুপাতো ভাই-বোনদের বিয়ে হয়, কি লজ্জার কথা। ছিঃ ছিঃ। আমি দেখেছি হিন্দু ধর্মের ভিতরে বড় ভাই, ছোট ভাইয়ের বৌয়ের সঙ্গে পরকীয়া, দেবর ভাবীর সঙ্গে, মামা ভাগনির সঙ্গে। তবে এদের মধ্যে তালাক ব্যবস্থা নেই। কারণ এদের বিয়ে সাতপাকে বাধা। প্রতিটি পাকেই আছে একটি করে শক্তিশালী আইন।

সমস্ত এলাকা জানাজানি হয়ে গেল। আমি এয়ারপোর্ট এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেলাম রাজাবাজারে। এখানে অনেক বাংলাদেশি ছাত্র থাকতো। এলাকাটি মুসলিম। আমি মামুনের সঙ্গে থাকলাম। আর মনে মনে ভাবতাম, এবার আয় কে আসবি, এটা মুসলিম এলাকা! হিন্দুরা মুসলিমদেরকে দারুণ ভয় পায়। এয়ারপোর্টে যে সমস্ত বাংলাদেশি ছাত্ররা থাকতো অর্থাৎ আমার বন্ধুরা ভীষণ বিপদের মুখে পড়েছিল। এলাকার মানুষ গালিগালাজ করতো যে, কোনো বাংলাদেশিকে দেখলে কটলাদা বলছে আর আমাকে খুজছে মহামেডানের এতো সাহস, আমাদের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে।

যাদের সঙ্গে ছিল আমার এতো গভীর বন্ধুত্ব তাদের কাছে হয়ে গেলাম শত্রু। ভাবটা এমন হয়ে দাড়ালো, আমাকে খুন করতে পারলে স্বর্গের দরজা খুলে যাবে। মিতুর মামা আবার পুলিশ অফিসার। তাই শুরু হলো পুলিশ ও জনগণের যৌথ অভিযান। খুজে শাস্তি দেয়া। দিল্লি গিয়ে স্পেনে যাওয়া পিছিয়ে দিলাম। মিতুর সঙ্গে যোগাযোগ হতো ই-মেলের মাধ্যমে। সবাই ভেবে নিল আমি স্পেনে চলে গেছি। তাই পরিবেশ শান্ত।

মিতু সবুজ সংকেত দিল রাজাবাজারে আসার জন্য।

ফিরে এলাম রাজাবাজারে। মিতু রাজাবাজারের সামনের কলেজে পড়ে। তখন কলেজ বন্ধ করে আমার ঘরে কলেজ করতো। হঠাৎ মিতুর পিরিয়ড বন্ধ মানে গর্ভধারণ করেছে। দুজনে মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম গর্ভপাত। সুন্দরভাবে গর্ভপাতের কাজ সম্পন্ন হলো, আমি ইনডিয়া ছাড়লাম।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ শুরু হলো। প্রথমে প্রথমে প্রতিদিন ই-মেল পেতাম। তারপর সপ্তাহে, এরপর মাসে, হঠাৎ বন্ধ। আমি অস্থির হয়ে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বিফল।

এক বছর পর কলকাতার মাটিতে পা রাখলাম। কলেজে গিয়ে মিতুর সঙ্গে দেখা করলাম এবং নিজের কানে শুনতে পেলাম *অতীতে যা করেছি তা ছিল আমার ছোটবেলার ভুল। এখন আমি বুঝতে পারি। তাই কোনো মহামেডানকে বিয়ে তো দূরের কথা, ভালোবাসতেও ঘৃণা হয়।*

পরের দিন চেষ্টা করতে যাওয়ার সময় পুলিশ ধরে ফেললো। মিতুকে কলেজ থেকে ডাকা হলো শনাক্ত করার জন্য। মিতু আমাকে শনাক্ত করলো আর বলে গেল, উচিত শিক্ষা দিন যেন আমাকে আর বিরক্ত না করে।

পুলিশ অফিসার মিতুর মামাকে টেলিফোন করলো।

বুঝতে পারলাম, কিছুক্ষণের মধ্যেই মামা চলে আসবে এবং আমাকে পাকিস্তানের চর বানিয়ে চালান করে দেবে। পকেটে যতো টাকা ছিল পুলিশ অফিসারকে ঘুস দিয়ে মুক্তি পেলাম। শর্ত ছিল, এক ঘণ্টার মধ্যে ইনডিয়া ছাড়তে হবে।

কলকাতা ছেড়ে বাংলাদেশে এসে একটি কম্পানিতে চাকরি নিয়ে কাজে মনোনিবেশ শুরু হলো। প্রায় মাস তিনেক পর খবর পেলাম। আমার প্রিয় মাসি ববি বসু ও আমার হৃদয় মিতু চৌধুরী আর নেই, স্বর্গে চলে গেছেন।

ঠিকানা বিহীন
radakol@yahoo.es

হেলেন

– এম রেজাউল করিম

২০০৪–এর জুলাই মাস হবে। মালিবাগ মোড়ে *আয়েশা শপিং কমপ্লেক্স*–এ *আশ্রয়* মিডিয়া সেন্টারের ফোন নাম্বার পেলাম পত্রিকায়। এটি ছিল একটি ম্যারেজ মিডিয়া। মিডিয়াটিতে কাজ করেন এক ভদ্রমহিলা। নাম নিলুফার। এডভোকেট হলেও শখের বসে এ পেশা করেন বলে জানালেন।

আমি যে মন্ত্রণালয়ে চাকরি করি তার অধীনস্থ এক বুরোতে কাজ করেন একজন উপপরিচালক। তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় তার জন্য মেয়ে দেখার ব্যাপারে নিলুফারআপার সঙ্গে কথা বললাম।

এখানে উল্লেখ্য, আমাদের উপপরিচালকটি ছিলেন বিপত্নীক। তার পনেরো–ষোল বছরের একটি মেয়ে আছে। স্ত্রী মারা গেছে এক বছর হবে।

যাহোক, নিলুফারআপা একটি মেয়ের সন্ধান দিলেন। মেয়েটির স্বামী নেই। একটি বাচ্চা আছে। ক্লাস নাইনে পড়ে।

সব কিছু শুনে উপপরিচালকের পছন্দ হলো। তাই একদিন মিডিয়া সেন্টারে গেলাম। আমি আমাদের ক্যাশিয়ার ও সেই উপপরিচালক। এভাবে নিলুফারআপার সঙ্গে আমার পরিচয়।

একদিন তিনি আমার বিয়ের ব্যাপারে বললেন। আমিও কিছুটা আগ্রহ দেখালাম। তিনি ছবি দেখালেন।

একটা মেয়ে আমার পছন্দ হলো। নাম হেলেন। একটা মাল্টিন্যাশনাল কম্পানিতে চাকরি করে।

আমি ওর অফিসে ফোন করলাম। মেয়েটি ধরলো। কথাবার্তায় একটা সময় ঠিক করলাম যে সময় আমরা মিট করতে পারি। স্থান হলো শান্তিনগর মোড় *পিকিউএস*–এর সামনে।

যথাসময়ে গেলাম। অনেকক্ষণ পরে সে এলো। আগে থেকে বলা জামা–পাজামা না পরলেও বুঝেছিলাম তিনিই হেলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি হেলেন?

বললেন, হ্যা।

আপনার অরেঞ্জ কালারের জামা পরে আসার কথা।

ধুতে দেয়ায় ওটা পরা হয়নি।

কোথাও বসা যাক।

চলুন, কর্ণফুলী গার্ডেন সিটির চার তলায়।

রাজি হলাম।

জানলাম সে আমার ইয়ারমেট। অর্থাৎ আমরা উভয়ে নব্বই সালে এসএসসি করেছি। কতোক্ষণ আলাপ করার পরে চলে এলাম। তাকে দিলাম দুটো এমপি থৃ।

এভাবে শুরু।

তাকে নিয়ে অনেক ঘুরেছি। সংসদ ভবন, ঢাবি ক্যাম্পাস, বন্ধুর বাসা। অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি দুবার। একবার সংসদ ভবনের সামনে, আরেকবার ঢাবি ক্যাম্পাসে। দুটো ঘটনায় পকেট থেকে এক হাজার টাকা ছিনতাই হলো।

এরপরেও তাকে নিয়ে যেতাম এলাকার ছেলেদের মেসে যেখানে আমার ছোট ভাইও থাকে। হেলেনের অবশ্য এ জায়গাটাই পছন্দ। সে এখানে ফৃ কথা বলতে পারে। গল্প, আড্ডায় এলাকার ছেলেরা ও হেলেন বন্ধুর মতো হয়ে গেছে।

বিয়ের কথা ভুলে গেলাম। এর মধ্যে একটু একটু করে তার প্রতি দুর্বল হয়ে গেছি। তাকে বললাম সে কথা।

সে ঠাণ্ডা ভাব দেখালো।

প্রায় দিনই তার সাথে ফোনে কথা হয়। আমি বলি, চলো বিয়ে করি।

সে বলে, আমরা বন্ধু।

কিন্তু আমি যে তাকে চিরসঙ্গী করতে চাই। হারাতে চাই না। এ ব্যাপারটি তাকে বোঝাতে পারি না।

ছোটবেলা থেকেই আমি কিছুটা ইমোশনাল। তাছাড়া জীবনে মেয়ে বন্ধু তেমন আসেনি বললেই চলে। এর মধ্যে তার বিয়ের ব্যাপারে বৈপরীত্যভাব আমাকে ভীষণ ভাবায়। ভাবি তাকে তাহলে পাবো না!

তার মুখশ্রীতে একটা ভালো মানুষি ছিল যা আমাকে খুব আকৃষ্ট করতো। ভাবতাম সে আর যাই হোক, কাউকে ঠকাতে পারে না।

তার ব্যাপারে ভাবতে ভাবতে একদিন খুব কাদলাম। জীবনে কোনোদিন কারো জন্য কাদিনি। কিন্তু তার জন্য নিজেকে কেমন যেন সামলাতে পারছিলাম না। ভাবলাম কেন এমন হলো। যাকে ধরতে চাই সে কেবলই না হয়ে যায়। দেখলাম আমিও কাদতে পারি। একটি মেয়ের জন্য কোনো ব্যক্তি সাধারণত কাদে না।

ভাবতাম একটি পুরুষ মানুষ একটি মেয়ে মানুষের জন্য কেন কাদবে। কেন তার জন্য জীবন দিতে চাইবে। আমার জীবন থেকে দেখলাম ভালবাসার জন্য কাদাও সম্ভব, জীবন দেয়াও সম্ভব।

আজও হেলেনকে নিয়ে ঘুরতে যাই, বেড়াতে যাই। কখনো খুব দুর্বল হই। তাকে বলি।

সে বলে, জগতে ইমোশনাল হলে হয় না। বাস্তববাদী হতে হয়।

আর আমি ভাবি, চেষ্টা তো করি। কিন্তু কেন যে পারি না তা আমার অজানা।

শান্তিবাগ, ঢাকা থেকে

ছোটমা

– মৌসুমী হোসেন

আমি বত্রিশ বছর পার করা এক নিসঃঙ্গ রমণী। পাতাগুলো ঝরে যায় চোখের সামনে। আমি ঝরে যাই মুহূর্তে। আমার প্রাণপ্রিয় প্রথম স্বামী হারানোর পর মাসুদকে বিয়ে করি। তার মৃত স্ত্রীর দুটি সন্তান আছে যারা আমাকে ছোটমা ডাকে। সামি আমার ছয় বছরের ছেলে। একটু রাগী। কিন্তু ভীষণ রকম ভালো। সাকিবের চোদ্দ বছর বয়স। খুব চুপচাপ এবং যথেষ্ট ভদ্র। তারা সাউথ বৃজ স্কুলে পড়ে। আমার মনে হয় সৎমা হয়েও আমি তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হতে পেরেছি। এরা আমার খুব প্রিয় বাচ্চা। এদের সঙ্গে আমার রক্তের উৎস নেই। আছে ভালোবাসা এবং আদরের সম্পর্ক। তারা আমাকে মা বলে ডাকে।

আমার বাবু মারা যাবার পর এই মা ডাক শোনার জন্য কতো বছর যে অপেক্ষা করেছি। মা ডাক শুনলেই আমার সমস্ত দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যায়। এর চেয়ে মধুর ডাক আর কি হতে পারে! আমাদের সমাজে স্বামী ও সন্তান না থাকলে সে স্ত্রী, বোন, ভাবী কতোটুকু মানসিক, শারীরিক নির্যাতন হয়। এ কথা একমাত্র বিধবা ও নিঃসন্তানরাই বলতে পারেন। সমাজ, সংসার, এমনকি স্বামীর বাড়ির আত্মীয়রা যথেষ্ট অবহেলা করে। স্বামী এবং স্বামীর আত্মীয়রা বিধবা, নিঃসন্তানদের যখন-তখন বাড়ি থেকে বের করে দেন।

যুবতী বিধবা বা ডিভোর্সি মেয়েদের সমাজের এক শ্রেণীর লোকেরা লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায় শরীরের দিকে। সুযোগ পেলে শরীরে হাত দেয়। কোনো বিয়েবাড়ি, জন্মদিনে অথবা সকালে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় আমার মতো সন্তানহীন মেয়েলোক দেখলে নাকি কার্য হাসিল হয় না।

স্বামী বলে, কোনো নিমন্ত্রণে আমাকে না দেখলেই নাকি সবাই খুশি হয়। কারণ আমি বন্দ্যা মেয়ে। তার আত্মীয়রা আমার সৎ বাচ্চাদের শিখিয়ে দেয়, স্বামীর বাড়ি-গাড়ি, সহায়-সম্পত্তি, টাকা-পয়সা যেন নাবালক বাচ্চারা তাড়াতাড়ি তাদের বাবার কাছ থেকে বুঝে নেয়। তা না হলে আমি সব স্বামীর কাছ থেকে নিয়ে যাবো। আর সে জানতে চায়, আমি তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করি নাকি, খেতে দিই নাকি? ইত্যাদি।

আমার সামি, সাকিবের স্কুলে গেলে তার বন্ধুর অত্যুৎসাহী শিক্ষিত মায়েরা জিজ্ঞাসা করে, বাচ্চারা আমাকে ভালোবাসে কি না? স্বামী আমার দেখাশোনা করে কি না? আমাকে শাড়ি, গহনা, টাকা-পয়সা, বাড়ি,

জায়গা–জমি কিছু দিয়েছে কি না? প্রতিদিন বাচ্চাদের স্কুল থেকে আনতে গেলেই এ ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হই।

সবার থেকে আমি যে কতো আলাদা! আমাকে নিয়ে কানাকানি, দেখাদেখি করে। মাঝে মধ্যে তাদের নিত্যনতুন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে একটু উত্তেজিত হয়ে যাই। কেন দুই বাচ্চার বাবাকে বিয়ে করলাম। রাতে স্বামী আমার সঙ্গে, নাকি ছেলেদের সঙ্গে থাকে।

এসব শুনে মাথা গরম হয়ে যায়। তখনই সেই গল্পে সৎমা মানে খারাপ মাদের সঙ্গে তুলনা করে আমাকে। মাঝে মধ্যে বাইরে থেকে আহত মুখে ঘরে ফিরে আসি।

আমি সৎমা বলে যাদের মনে অনেক কুপ্রশ্ন আসে তারা নিজেরা তো জৈবিক বাবা মায়ের জৈবিক সন্তান। তবু তাদের শিক্ষার এতোটাই ত্রুটি থেকে গিয়েছে যে, তারা আমার মতো একটি সরল স্ত্রীলোকদের এসব কুটিল প্রশ্ন করতে পারে! এরা একবারও ভাবে না আমার মনের অবস্থা কি হতে পারে? আমি মনে করি, আমার এতো সুন্দর দুটি বাচ্চা নিয়ে সবচেয়ে সুখী। আমি চাই, তাদের মতো আরো সন্তান থাকলেও আমি খুশি। কারণ বাচ্চারা নিষ্পাপ, তাদের মন জয় করতে হলে একটু ভালো ব্যবহার, একটু আদরই যথেষ্ট। সঙ্গে চকোলেট এবং খেলনা দিলে তো আরো ভালো। আমার বড় ছেলে সাকিব তার যতো আবদার সব আমার কাছে। বন্ধুদের নিয়ে পিৎজা হাটে যাবে, স্পাইডারম্যান–টু দেখতে যাবে। এসব শুনতে আমার খুব ভালো লাগে। বাবার অনুপস্থিতিতে আমার অনুমতি চায়। আমি অসুস্থ থাকলে আমার খবর নেয়।

এ যুগের ছেলেমেয়েরা বাবা, মায়ের কথা শোনে না। অথচ আমার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা দেখলে চোখে পানি চলে আসে। তারা মানে সাকিব, সামি আমার চোখের সামনে থাকলে সব দুঃখ কষ্ট ভুলে যাই।

শ্রদ্ধেয় চায়নাআপা মানে বাচ্চাদের আগের মা, বাচ্চাদের এস্টাবলিশড দেখে যেতে পারেননি। সব সময় আল্লাহকে বলি যে, এই সন্তানদের আমি যেন মানুষ করতে পারি। আমার মনের অজান্তেও আমি যেন তাদের কষ্ট না দিই।

আমার ছোট ছেলে সামি গল্পের বইগুলোতে সৎমায়ের নির্যাতন পড়ে পড়ে তার ধারণা, সৎমা মানে খুব খারাপ মা। সে মা খেতে দেয় না, শারীরিক অত্যাচার করে।

আমার ছেলেরা যে আমাকে শ্রদ্ধা করে এটিতেই আমি খুব খুশি। আমার ঘর–বাড়ি, টাকা–পয়সা কিছুই চাই না। তাদের প্রতি আমার অনুরোধ, এই মা মানে আমি যদি মরে যাই আমার কবরের পাশে যেন তারা মাঝে মধ্যে গিয়ে বসে। তাতে আমার আত্মা শান্তি পাবে। আমার অনেক টাকা থাকলে পৃথিবীর সবচেয়ে দামি গিফট তাদের কিনে দিতাম।

সব সৎমা বাবাদের বলছি, হিংসা–বিদ্বেষ ভুলে সৎ ছেলেমেয়েদের অন্তরের অন্তরস্থল থেকে তাদের ভালোবাসা দিন, আদর, স্নেহ, মমতা দিন। যেসব বাচ্চারা কথা শোনে না, অযথা রাগারাগী করে বা সৎমা বাবাদের মেনে নিচ্ছে না তাদের উচিত বাচ্চাদের বোঝানো, শান্তভাবে গুছিয়ে, বুঝিয়ে সুন্দরভাবে কথা বলান। বাইরে বেড়াতে নিয়ে যান, কিছু কিনে দিন। দেখবেন কোন জিনিসটা তার প্রিয়, তার জন্মদিন পালন করুন। শাসনের পরিবর্তে আদর করুন। দেখবেন আপনার ধৈর্যের পরিচয় একদিন পাবেন। আপনাকেই সে শ্রদ্ধা করবে সবচেয়ে বেশি। তখন তাদের নিয়ে আপনার কোনো ঝামেলাই হবে না, হবে না কোনো টেনশন।

পরিশেষে বলতে চাই, মা–বাবা ও সন্তানরা সকলের জীবন সকলকে ঘিরে আবর্তিত। তাদের দেখে বোঝা যায়, সম্পর্কটা শরীরের নয়, ভালোবাসার। ভালোবাসার সুতায় জড়িয়ে গিয়েই মানুষ বেচে থাকার আনন্দ–বেদনা খুজে পায়। শিল্প সৃষ্টির উৎসও সেখানে, আমাদের জীবন মানবিকতার এক জীবন্ত দলিল। আমার সন্তানরা সেই দলিলের জীবন্ত অক্ষর।

পাঠকরা, আমার দুটি ছেলে এবং আমার জন্য দোয়া করবেন। তারা যেন দীর্ঘজীবী হয়।

ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে

সেই সব মেয়েদের জন্য

আমার বয়স বিশ বছর। আমার কোনো মেয়ে বন্ধবী নেই। আমি সর্বদাই সেক্সের যে কোনো বিষয়ে আগ্রহী। অনেকের কাছেই শুনেছি যে, হোটেলে মেয়ে পাওয়া যায়। কিন্তু যেতে সাহস পেতাম না।

এক হোটেলের সন্ধান পাই। ঢাকায় অবস্থিত।

একদিন সকালে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হই। সেখানে পৌছে অনেক কষ্টে হোটেলটা বের করি।

আমার চোখের সামনে কতোকগুলো মেয়ে দাড় করানো হলো। মেয়েগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে আর তাকাতে পারছিলাম না। তাদের সবার মুখেই বিরক্তির ছাপ। তাছাড়া তাদের দেখেই বোঝা যায় যে, এরা ইচ্ছাকৃতভাবে এসব করতে আসে না। আমার পক্ষ থেকে এসব মেয়েদের জন্য অসংখ্য গোলাপের ভালোবাসা রইলো।

সবশেষে আমার দুটি কথা লিখছি।

প্রথমটি হচ্ছে আমার প্রার্থনা। হোটেলের কিংবা রাস্তার যেসব মেয়েরা দেহ দান করে তাদেরকে দয়া করে ঘৃণা করবেন না। তাদের জন্য *বেশ্যা* কিংবা *মাগি* এসব বাজে শব্দ ব্যবহার না করাই উত্তম। কোনো মেয়েই ইচ্ছাকৃতভাবে এই পেশায় নামে না। তাদের নামতে বাধ্য হতে হয়।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমার উপদেশ। যারা মনে করে হোটেলের মেয়েদের সঙ্গে সেক্স এনজয় করা যায়, এটা সম্পূর্ণ ভুল। দয়া করে বিয়ের আগে কোনো যৌন মিলনে লিপ্ত হবেন না।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

ধন্যবাদ

– মহিউদ্দিন রুবেল

আমি তখন ক্লাস নাইনের ছাত্র। রমজানের এক মাস ছুটিতে নানুবাড়িতে পড়ার আনন্দে রওনা হলাম। এদিকে চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি থেকে ইকোনমিক্স ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা শেষ। তাই মেজ মামাও বাড়ি এলেন। মেজ মামা অবশ্য আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্ব এ জন্য বলছি, মামার অনুসরণ-অনুকরণ ছিল পাথেয়।

যা হোক, প্রচুর আগ্রহ, উদ্দীপনা নিয়ে পড়ছি। হঠাৎ চোখ আটকে গেল পাশের ঘরের নিগাঢ় হারুন মুননীকে দেখে। ডাগর ডাগর চোখে এতো সুন্দর মায়াবী চাহনি, কামুক ঠোঁট, প্রলুব্ধ করার মতো কণ্ঠস্বর। তবে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করতো যখন সে সিল্কের লাল জামা পরতো, নিজেকে কিছুতেই সামলাতে পারতাম না। তাকে এক নজর দেখতে ইচ্ছে করতো। প্রচণ্ড ইচ্ছা জাগতো ইশ! কতো জানি রহস্য লাল পর্বত যুগলের গহীনে!

আত্মবিশ্বাস যোগালাম, লাল পাথরের সু-উচ্চ পর্বতের চূড়ায় দাড়িয়ে নদীর স্বচ্ছ স্রোতধারার দর্শন না-ইবা পেলাম, পর্বতের নরম এতোটুকু স্পর্শ নদীর জলে তৃষ্ণা নিবারণ থেকে কেন বঞ্চিত হবো?

খোজখবর নিয়ে জানতে পারলাম, আমার স্বপ্নের রাজকুমারীর আমারই মেজ মামার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। একটু একটু ইটিশ-পিটিশও চলছে।

বুদ্ধি আটলাম আত্মবিশ্বাসকে বাস্তব রূপ দিতে। যেই বুদ্ধি সেই কাজ। হুবহু মামার হাতের লেখাকে অনুলিপি করে লিখলাম – আগামীকাল রাত এগারোটায় তোদের লেবু বাগানে আসিস।

ইতি

মাহবুব-ই-এলাহী

সন্ধ্যায় চিরকুটটি জানালা দিয়ে পড়ার টেবিলে নিক্ষেপ করে ভো দৌড় যেন সে আমাকে চিনতে না পারে। আল্লাহর অপরিসীম মেহেরবাণী, দিনের বেলায় হয়তো তাদের সাক্ষাৎ হয়নি, এদিকে তীর্থের কাকের মতো লেবু বাগানে প্রতীক্ষায় আছি রাত এগারোটা পর্যন্ত।

উল্লেখ্য, সন্দ্বীপে বিদ্যুৎ না থাকায় সন্ধার পর ঘোর অন্ধকার হয়ে যায় এবং লোকজনও অল্প সময়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

চারদিক নিস্তব্ধ, ঝি ঝি পোকার শব্দে নির্জনতা ভঙ্গ হয় আর দুই চারটা মশার উপদ্রব ছিল বিরক্তিকর। তারপরও ভয় এবং আনন্দের মাঝামাঝিতে প্রহর গুণছি।

একটু পরে দরজার খট খট শব্দ। সে কথা রেখেছে। যেই মাত্র সে বাগানে প্রবেশ করলো, আমি আমার উপস্থিতি জানান দিয়ে পেছন থেকে বাহুবন্ধনে স্তনের চূড়া থেকে ভিত পর্যন্ত পরম আনন্দে নব আবিষ্কারের নেশায় মত্ত। কখন যে মনের অজান্তে তরল ধারায় হাত খেয়ালি হয়ে নদীর জল ছোবে বলে আনন্দিত। ঠিক সেই সময়ে তার অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে যেই মাত্র অকপট উক্তি, আচ্ছা, ঠিক আছে। অমনি বিধি বাম!

সে কণ্ঠস্বর চিনে ফেললো। মুহূর্তে ধাক্কা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে ঝড়ের বেগে প্রস্থান।

আমার সমস্ত শরীর থর থর করে কাপছে অজানা আশংকায়।

সকালে ঘুম থেকে উঠে পুকুর ঘাটে যাওয়ার সময় দেখি মামা হন্তদন্ত হয়ে আমার দিকে ছুটে আসছেন।

আমার বুঝতে বাকি রইলো না শনির দশা সামনে এগোচ্ছে। চোখের পলকে বাশের কঞ্চির বেদম প্রহারের পর জ্ঞান ফিরলে নিজেকে আবিষ্কার করি একশ চার ডিগ্রি জ্বরে বিছানায় শুয়ে আছি।

বিকেলবেলা আচমকা মুননীকে দেখি একগুচ্ছ গন্ধরাজ নিয়ে আমার শয্যা পাশে বসা। গন্ধরাজ গুচ্ছটি হাতে তুলে দিয়ে বললো, *গত রাতের অনুভূতির জন্য তোমাকে ধন্যবাদ, এই স্মৃতি আমি ভুলবো না।*

আর আমি ধন্যবাদ জানাই আমার মামাকে যার কারণে হয়তো মুননী আফসোস প্রকাশের নিমিত্তে আমাকে ফুলের শুভেচ্ছাসহ স্মৃতিতে ভাস্বর করে রাখবে অনন্তকাল।

সন্দ্বীপ থেকে

সেদিন দুজনে

– মিত্রপ্রেমী

আমার মনের মধ্যে একটা অখণ্ড আনন্দের দৃশ্য সব সময় বিচরণ করে। তাকে কোথা থেকে শুরু করবো, কোথায় শেষ করবো ঠিক বুঝতে পারি না। বসে বসে বাক্যের পর বাক্য যোজন করতে ইচ্ছে করে না। তারপরও ...।

প্রেম যে হঠাৎ করে আমার মনের দরজায় কড়া নাড়বে ঠিক বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম প্রেম হবে অজানা কোথাও, অচেনা কারো সঙ্গে। কিন্তু সে সুযোগটা অধরা আর দেয়নি।

অধরা আমার বন্ধু। বন্ধু ছাড়া কিছুই ভাবিনি ওকে নিয়ে। সব কথা বলা যেতো ওকে। কতো কি করেছি আমরা এক সঙ্গে খুব ভালো বন্ধু ছিল ও আমার। কিন্তু একদিন পূর্বাহ্নে হঠাৎ বলে ফেললো ...।

আমি প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি।

তারপর অধরা কেমন করে কখন যে একান্তই আমার হয়ে গেছে বুঝতে পারিনি। আমাদের দেখা–সাক্ষাৎ হতো খুব কম। কথা হতো কাগজ–কলমে।

বলা নেই, কওয়া নেই অকস্মাৎ একদিন দুজন মুখোমুখি। অধরা তখন থাকতো একটা মেসে। আমায় পেয়ে যেন চাদ হাতে পেল। ঠোটের বাকে একটু হাসি চাপা দিয়ে বললো, কেমন আছিস।

বললাম, ভালো।

আরো অনেক কথা হলো। এক সময় অধরা বললো, কাল সকাল সাতটায় একবার আসবি?

কেন?

কাল আমরা একটু ঘুরবো।

আমি কিছুক্ষণ নির্বাক। কি যেন ভাবছিলাম। বললাম, ঠিক আছে আসবো।

কথা মতো পরদিন সাতটায় দেখা হলো। তখনো সূর্যের আলো গায়ে লাগেনি। বসন্তের প্রথম সপ্তাহ চলছে। চারদিক হালকা কুয়াশা। আমরা দক্ষিণ রাস্তায় হাটতে শুরু করলাম। শহর থেকে একটু দূরে এই পথ। রেললাইন পাশ দিয়ে চলে গেছে। নির্দ্বিধায় হাটছি।

এক সময় অধরা বললো, আমার ভয় লাগছে।

বিস্মিত হয়ে বললাম, কেন?

যদি চেনা কারো সঙ্গে দেখা হয়?

এতো সকালে কার সঙ্গে দেখা হবে?

এবার রাস্তা ছেড়ে রেললাইন দিয়ে হাটছি। কারো মুখে কোনো কথা নেই।

নীরবতা ভেঙে রেল লাইনর টুকরো পাথরের দিকে তাকিয়ে বললাম, কিছু বলছিস না যে?

পেছনে তাকিয়ে দেখি ওভারবৃজটাও আর দেখা যাচ্ছে না। বহুদূর চলে এসেছি। সব অচেনা লাগছে। কোথায় যাচ্ছি কে জানে।

এক সময় অধরা বললো, আর হাটবো না। চল ওইখানে বসি।

রেললাইন থেকে অদূরেই জায়গাটা। বাশ ঝাড়, পেছনে পুকুর। পুকুরপাড়ে ইটের ভাঙা দেয়াল। নির্জন। চারদিকের শোভা দেখে মুগ্ধ হলাম।

দেয়ালটা দেখিয়ে দিয়ে বললাম, এখানে বস।

মুখের বাতাসে দেয়ালের ধুলা উড়িয়ে পাশাপাশি বসলাম। সূর্যের আলো তখনো কৌণিক। দেয়ালে নখ ঘষতে ঘষতে অধরা বললো, জানিস, আমার বিয়ের কথা হচ্ছে।

কবে থেকেই তো শুনছি বিয়ের কথা হচ্ছে।

আবেগী কণ্ঠে অধরা বললো, অন্য কোথায় বিয়ে দিলে আমি ...।

আমি ওর সামনে দাড়ালাম।

অধরা আমার শার্টের বোতাম নাড়ছে।

ওর হাতটা হাতের মধ্যে নিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে বললাম, তুই কি সত্যিই আমাকে ভালোবাসিস?

প্রতি উত্তরে অধরা বললো, কেন? বিশ্বাস হয় না?

কেন জানি আমি ওর ভালোবাসাকে বিশ্বাস করতে পারতাম না। ও আমাকে এতো ভালোবাসবে কেন? কি এমন আছে আমার যা অন্য কারো নেই।

বহুক্ষণ কথা বলছিলাম ওর হাত ধরে। কি যে মনে হলো, এক সময় ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা অধরা, আমাকে কি তোর জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে?

কোনো জবাব পাওয়া গেল না।

আবার বললাম, চুমু দিতে ইচ্ছে করে?

নত শিরে অধরা জবাব দিল, হু।

বললাম, বাধা কিসের?

জানি না। সংক্ষেপে বললো।

লাজলজ্জার বলি দিয়ে বললাম, দিই একটা।

মাথা নেড়ে জানালো, না।

ইচ্ছে করে, তাহলে না বলছিস কেন?

মানুষের সব ইচ্ছা পূরণ হয় না।

তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু আমরা ইচ্ছ করলেই এটা করতে পারি।
আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, অধরা ওর প্রচণ্ড ইচ্ছাটাকে বুকে পাথর চাপা দিয়ে আছে।
জানতে চাইলাম, ভয়, নাকি লজ্জা?
অস্ফুট স্বরে বললো, দুটোই।
ভয় আর লজ্জায় মাথা হেট করে আছে ও বহুক্ষণ থেকে।
পাশ থেকে জড়িয়ে ধরে বললাম, ভয় পাসনে। তোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করবো না।
অধরা যেতে চাইলো।
আমি ওকে বন্ধন মুক্ত করে বললাম, যাবি, তাহলে যা।
অধরা গেল না।
বললো, এরপর তোকে মুখ দেখাবো কিভাবে!
শুকনো ঠোটে মৃদু হেসে বললাম, এতো লজ্জা তোর!

অধরা চুপ করে রইলো।
আমি দুই হাতে ওর মুখ আলতো করে ধরে আমার মুখের কাছে আনলাম।
ও চোখ বন্ধ করে আছে।
আমি ওর মসৃণ ঠোটে ঠোট ডুবিয়ে দিলাম। এভাবে কিছুক্ষণ।
আবেগে কামারের হাপরের মতো ও ফোস ফোস করছিল। এক সময় ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। দুই হাতে মুখ ঢেকে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকলো।

অস্ফুট স্বরে বললাম, রাগ করেছিস?
অধরা না সূচক মাথা নাড়লো।
ভয় আর লজ্জায় ও তখন বাকরুদ্ধ।
অনেকক্ষণ হলো কারো মুখে কোনো কথা নেই।
আমার কথা মতো অধরা উঠে দাড়ালো।
হাটতে শুরু করলো আমার সঙ্গে।

জয়পুরহাট থেকে

যেমন আছি

- মাহমুদ আরিফ

আমরা এক সঙ্গে পাঠশালায় যাই, এক সঙ্গে ফিরে আসি। বাড়তে থাকি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। সূর্যাস্তের পর ও ওদের বাসায় ফিরে যায়, আমি আমার। দ্বাদশ বর্ষে আমরা নতুন করে সব দেখি – পাখি, ফুল, প্রজাপতি, নদী, পাহাড় সব। সবচেয়ে ভালো লাগে যখন ও আমাকে, আর আমি ওকে দেখি। এসবের মাঝেই পৃথিবীতে বর্ষা এসে গেছে। এবং সঙ্গে নিয়ে এসেছে – স্নিগ্ধ, কদমের ফুল। এমনি এক অঝোর বর্ষায় আমার কানে এলো, ওর আব্বা বদলি হয়েছেন। তাই সহসা ওরা অন্যত্র চলে যাবে।
দেখতে দেখতে দিন ফুরিয়ে এলো। লাল কালিতে ভরে উঠলো আমার ক্যালেন্ডারের পাতা। দ্বাদশ বছরের সেই নির্বোধ ছেলেটি মেঘে মেঘে ভরা কালো আকাশের এমন সকরুণ রূপ আগে আর কখনো দেখেনি। কি–ইবা এমন হয় যদি আরো কয়েকটি বর্ষা এসে পৃথিবীর গাছে–গাছে আরো কয়েকটি কদমের ফুল ফুটিয়ে দিয়ে

যায়! আমার আশার মাঝেই তোমাদের বেলা শেষ হয়ে আসে। জানি না, আমার এ পৃথিবীর বাইরে আবার অন্য কোনো পৃথিবীর পানে তোমাদের চলে যাওয়া। মনের কোনো মানে বোঝার আগেই আমার স্বপ্নের সেই ভালোবাসার কদমের ডাল ভেঙে পড়ে। আকাশ ভরা মেঘের পটভূমিকায় আমার হৃদয় ভরা মেঘ আমার দুই চোখে অনন্ত বর্ষার প্লাবন দিয়ে যায়।

দ্বাদশ বর্ষ থেকে আমি ঊনবিংশ বর্ষে পা রেখেছি। ইতিমধ্যে আমার সমস্ত ভালোবাসা তামাদি হতে চলেছে।

অঝোর বর্ষায় আরেক মন উদাস করা সন্ধ্যায় কলাভবনের সামনে দাড়িয়ে কবিতার লাইন খুজছি। আর তুমি আমার শৈশবে হারিয়ে যাওয়া সেই অমীমাংসিত স্মৃতির ক্যানভাসে পুরো কবিতা হয়েই আমার পাশে এসে দাড়ালে। আমি আনমনে মোহাবিষ্ট চোখে তোমার দু চোখের পানে চেয়ে রইলাম জানি না কতোক্ষণ। রঙধনুর সাতটি নয়, শ শ, হাজার হাজার রঙ আমার হৃদয় রাঙিয়ে ভালোবাসার সুতীব্র আবেগে যেন বলতে লাগলো, আমি বর্ষা নই, ফুল নই, কদম নই, কোনো কবিতার কোনো ছন্দ নই, তোমার হৃদয়ের সব দুয়ার খুলো, আমি হিয়া হয়েই তোমার মাঝে এসেছি। তুমি আমাকে গ্রহণ করো।

আমাদের পরিচিতি বাড়ে। পারস্পরিক হৃদ্যতা, সহমর্মিতা, আন্তরিকতা গভীর থেকে গভীরতর হয়।

আমি তোমাদের মাঝে আসি, হলে ফিরে যাই, তোমাদের গল্পের সঙ্গী হই।

দিন আসে, বছর হারিয়ে যায়। ফাইনাল পরীক্ষার চাপ, পড়া হয় না কোনো কিছুই। সারা রাত জেগে জেগে চোখ খুলে চেয়ে চেয়ে ক্লান্ত হয়ে যায় চোখ। নয়টার ক্লাসে আমি সাতটা বাজাই, হাজির হয়েই তোমার প্রতীক্ষায় থাকি। কেউ জানে না কিছুই। *বন্ধু* কেমন আছিস? এর বাইরে বেশি কিছু না। হলের তথাকথিত ক্যাডাররা তোমার পাশ দিয়ে বড় বেশি বেশি হেটে যায়। আমার দিকে চোখ রাঙায়। আমার সীমাবদ্ধতা বাড়তে থাকে। নিজস্ব গণ্ডি, ভাবনা, চিন্তা, দৃষ্টি আরো সংকুচিত হয়ে আসে। তোমার দু চোখে প্রশান্তি। সেখানে আমি ভালোবাসা পাঠ করি।

একদিন বিকেলে তুমি আমাকে আহ্বান জানালে। টিএসসির সবুজ চত্বরে বসে স্বপ্নে আমার হাত ধরে হেটে যাওয়ার কথা বললে। আমার বাকরুদ্ধ হয়ে আসে। চোখ বন্ধ করলেই কাটা রাইফেলের ধাতব নল দেখি। তোমার খোপার ফুল তোমার খোপায় গুজে দিয়ে কাপা কাপা হাতে সম্পূর্ণ মিথ্যা লিখলাম–

Don't walk in front of me, I may not always follow
Don't walk behind me, I may not always lead.
Just walk beside me, and be my friend.

তুমি তীব্র অভিমানে কিংবা রাগে বললে বন্ধু হয়েই তো আছি। তবে এতো ভনিতা কেন?

তুমি ক্যাম্পাস ছাড়লে, আর এলে না। আমার হৃদয়ে হাহাকার বেড়ে গেল। যখনি প্রজাপতির ডানার দিকে, বর্ষার কদমের ফুলের দিকে তাকাই, যখন তোমার সব স্মৃতি আমার নয়ন মুদিত করে তখন আরো ব্যাকুল হয়ে যাই। ভালোবাসায় যেন শুধু Entrance আছে, যেখানে কোনো *Exit* নেই। আমি প্রবেশ করেছি সেথায় বের হই কিভাবে।

ভালোবাসার পথ খুজতে খুজতে আমি যে আজ জীবনের পথ হারিয়ে ফেলেছি। ভালোবাসার প্রবল স্রোতে আমার হৃদয়ের চর ভাঙতে ভাঙতে জীবনের খেয়াঘাট এখন আমার প্রান্তিক সীমানায় এসে পৌছেছে। তোমার ভালোবাসার কামনা, প্রীতি, হৃদয়ের উদারতা দিয়ে হয়তো আমার এ ভাঙনকে রুদ্ধ করো। নাহলে তোমার হৃদয় আকাশে আমার তিল তিল করে সযত্নে লালিত হাজারো রাতের অশ্রুতে ভেজা সঞ্চিত ধনে তৈরি ফানুষের নাটাই কেটে দাও। আমি পথ হারা হয়েও পথ খুজে পেতে চাই তোমার হৃদয় সীমানার বাইরে গিয়ে। যদি কোনো বিশুদ্ধতম ভুলেও তোমার একটিবার ভুল ভাঙে তবে আমার এ দুর্গম পথে সঙ্গী হয়ে এসো প্রিয়। খলিল জিবরানকে কি তোমার আর মনে পড়ে না –

When love beckons to you. follow him,
Though his ways are hand and steep.

এসব ভাবতে ভাবতেই ঢাকা শহরে আমার দ্বীপ নিভে এলো। হৃদয় মন্দির আমার আধারে আধারে ঢাকা পড়ে গেছে। আধারের মাঝেই আলো খুজে ফিরি। সুরমা নদীর পাশ দিয়ে হাটি সকাল, বিকেল, দুপুর। মাঝে মধ্যে ছুটে যাই সূর্যাস্তের দিকে। কখনো বা পাহাড় চূড়ায় উঠি সূর্যাস্ত দেখার আশায়। কিন্তু জ্বলন্ত সূর্য বুকে নিয়ে পৃথিবীতে নেমে আসি।

আবারও এসেছে বর্ষা। অঝোর বর্ষায় আমিও ঢাকা ফিরে আসি। রাতের অন্ধকারে কর্মকোলাহলময় ঢাকা চুপচাপ হয়ে আছে। বৃষ্টিভেজা রাতে তোমাদের দরজায় কড়া নাড়ি। এ যেন হাজারও বছর পরে দেখা। শান্ত, স্নিগ্ধ, জলপরী যেন শ্বেত-শুভ্র পবিত্রতায় দেবী আসনে বসে আছে। আর আমি যেন এক অচ্ছুত পুতিগন্ধময় পূজারি। সে কেবলি অনন্তকাল ধরে হৃদয় মন্দিরের চাতালে নীরবে অশ্রু বিসর্জন দিয়েছে। কিন্তু মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দেবী প্রতিমায় ভালোবাসার অর্ঘ নিবেদনের অধিকার পায়নি।

তুমি হাত বাড়ালে আমার দিকে। *বর্ষণ মন্দ্রিত অন্ধকারে এসেছি তোমারই দ্বারে, অতিথি রে লহো ঢাকি তব মন্দিরের একধারে।*

পরদিন বর্ষণ ভেজা সিক্ত, সফেদ সকালে আমরা হাটলাম পৃথিবীর সব ভালোবাসাকে বুকে নিয়ে। আর হৃদয়ের গভীরে নিদ্রিত এতো দিনের ভালোবাসাকে আকাশে আকাশে ছড়িয়ে দিয়ে আমি হাটতে হাটতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেও তুমি এতোটুকু অবসন্ন হয়ে পড়োনি। বিশ্রামকেই বুঝি বিশ্রাম দিয়ে তুমি কি অপূর্ব নজরুল গীতি গাইলে– *ছাতিম তরুর শীতল ছায়ায়, ঘুমাবো মোরা প্রিয়, ঘুম যদি পায়।*

কিন্তু হায়রে নিয়তি আমার! আজ সেই ছাতিম গাছের সব পাতা খসে পড়েছে আর আমার হৃদয়টুকু তোমার–আমার হাজার স্মৃতিতে ঢাকা পড়ে আছে। ভালোবাসার যে সবুজ পথে আমি এ পর্যন্ত হেটেছি সে পথ আবারো ধূসর, মলিন, বিবর্ণময়।

তোমার গায়ে হলুদের দিন ঘনিয়ে এলো। আবারও লাল-লাল কালিতে ভরে উঠছে আমার ক্যালেন্ডারের পাতা। আবারও বর্ষা আসবে, কদমের ফুল ফুটবে। সুন্দরী বধূয়া সঙ্গী করে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার আর মেজররা রয়ে যাবে। কিন্তু বড় দুঃখ, পৃথিবী থেকে বুঝি ভালোবাসা সহসা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। প্রিয় যায়যায়দিনের ভালোবাসায় তোমায় শেষবারের মিনতি –

Lives are for living I live for you.
Dreams are for dreaming I dream for you.
Hearts are for beating, mine beats for you.
Angels are for keeping, can I keep you?

আটলান্টা, আমেরিকা থেকে
marif@itt-tach.edu

ইন লাভ উইথ লায়লা

– এম কে কায়েস

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। বেডসুইচটা অন করে দেয়াল ঘড়িটা দেখলাম রাত দুটো। লাইট অফ করে আবার ঘুমুতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঘুম এলোনা কিছুতেই। ঘরের জানালাটা খোলা। হেমন্তের হিমেল হাওয়া আর সঙ্গে এক চিলতে জ্যোৎস্না জানালা গলিয়ে প্রবেশ করছে। মনের জানালাটাও হঠাৎ খুলে গেল। পাচ বছর অতীতের অনেক কথা এসে ভিড় করলো সেখানে। বিছানা থেকে উঠে খাতা কলম নিয়ে টেবিলে এসে বসলাম।

তখন এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছি স্থানীয় কলেজ থেকে। হাতে অখণ্ড সময়। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা আর খেলাধুলা ছাড়া কোনো কাজ নেই। অনেকেটা সময় কাটানোর তাগিদেই টিউশানি করাই রুবেলদের। ওরা দুই ভাইবোন। রুবেল রূপা। রুবেল ক্লাস টু ও রূপা ক্লাস ফাইভের ছাত্রী। ওদের বাবা রেজাউল করিম বহুজাতিক

একটা কম্পানির কর্মকর্তা। তার অনুরোধেই পড়াই। রূপার স্কলারশিপ পরীক্ষা। তাই সকাল–সন্ধ্যা দুবেলা পড়াতাম।

এ রকম একদিন সন্ধ্যায় রূপাকে পড়িয়ে বাইরে বের হচ্ছি। ঘর থেকে বাইরে পা দিতেই কোথা থেকে গুড়ো মতো কি যেন মুখমণ্ডলে এসে লাগলো। রূপাদের ঘরে আবার ঢুকে পড়লাম।

আমাকে দেখে রুবেল ও রূপা খিলখিল করে হেসে উঠলো।

রূপাদের আয়নাটা মুখের সামনে ধরতেই চমকে উঠলাম। গোটা মুখমণ্ডল সাদা পাউডারে মাখামাখি হয়ে ভূতের মতো দেখাচ্ছে। মুখ–চোখ ভালো করে ধুয়ে রূপাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ কাজ কে করলো?

রূপা চুপি চুপি বললো, লায়লাআপু।

লায়লার বাবা রূপার বাবার নতুন কলিগ। বদলি হয়ে এসেছে। ফ্যামিলি নিয়ে আসেনি। শুধু এসএসসি পড়ুয়া মেয়েটাকে নিয়ে এসেছে নতুন জায়গাটা দেখাতে। এসে রূপাদের বাড়িতে উঠেছে। গত দুই দিন যাবৎ আছে সে। তাকে চোখে দেখিনি। কিন্তু তার সরব উপস্থিতি প্রতি মুহূর্তে টের পাচ্ছি। ওর জ্বালাতনে সত্যি আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি।

পরের দিন আবার পড়াতে গেলাম রূপাকে। ঘরে ঢুকতে যাবো তখনি মনে পড়লো লায়লার কথা। সতর্ক হয়ে গেলাম, না জানি এবার গায়ে রঙ এসে পড়বে!

আমার সতর্ক পদক্ষেপ দেখে রূপা মুখ টিপে হেসে বললো, আর ভয় নেই ভাইয়া, লায়লাআপুরা চলে গেছেন।

মনে মনে স্বস্তি পেলাম।

আমাকে অবাক করে দিয়ে রূপা তার বইয়ের ভেতর থেকে একটা চিরকুট এগিয়ে দিল। বললো, এই চিঠিটি আপু আপনাকে দিয়ে গেছেন।

চিঠিটি চোখের সামনে মেলে ধরলাম।

কি মশাই? আমি চলে গেছি শুনে খুব স্বস্তি পেলেন বুঝি? আসলে চলে যাইনি, বরং স্থায়ীভাবে আসার বন্দোবস্ত করে গেলাম। আব্বু বাসা ঠিক করে ফেলেছেন। এবার ফ্যামিলিসহ আসবো। জানি, এ কয়েকদিনে আপার ওপর খুব রাগ করেছেন। কি করবো বলুন, আপনাকে হঠাৎ এতো ভালো লেগে যাবে ভাবিনি। এবার এসে জ্বালাতন করবো না, বরং আপনার জবাবের অপেক্ষা করবো।

ইতি – লায়লা।

চিঠিটা পড়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। জানা নেই, শোনা নেই, মাত্র দুই দিনের জন্য এসে যে মেয়ে এতো সহজে প্রেম নিবেদন করতে পারে সে মেয়ে অবশ্যই বাজে প্রকৃতির। না জানি কতো ছেলের মাথা চিবিয়ে খেয়েছে। বিরক্তিতে চিঠিটা দলা পাকিয়ে ফেলে দিলাম।

এর মাত্র এক মাস পর একদিন লায়লার বাবা আমাকে রাস্তায় ধরে অনুরোধ করলেন তার ছেলেমেয়েগুলোকে পড়ানোর জন্য। কিন্তু লায়লার কথা মনে হতেই টিউশনির ইচ্ছাটা মন থেকে দূর হয়ে গেল। বললাম, আমার এক বন্ধুকে পাঠাবো। খুব ভালো ছেলে।

রেজা তাদের টিউশনি করাতে লাগলো। আর রেজাই হয়ে উঠলো লায়লার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। তার মাধ্যমে বার বার আমাকে প্রস্তাব পাঠাতো।

একদিন বিরক্ত হয়ে বললাম, এ রকম আচরণ করলে সত্যি সত্যি তোমার বাবাকে সব কিছু জানাতে বাধ্য হবো।

সেদিন থেকে তার সব ধরনের উৎপাত থেকে রক্ষা পেলাম।

তারপর অনেক দিন পেরিয়ে গেছে। প্রায় এক বছর। এর মধ্যে লায়লার এসএসসি পরীক্ষা হয়েছে। কৃতিত্বের সঙ্গে সে পাস করেছে।

এরপর রাজশাহী মহিলা কলেজে ভর্তি হয়ে একদিন চলে গেল রাজশাহী। ওর বাবা মাঝে মধ্যে আমাকে নিমন্ত্রণ করতেন। লায়লার কথা ভেবে সেসব প্রস্তাব কৌশলে এড়িয়ে যেতাম। কিন্তু এখন তো লায়লা নেই। তাই একদিন রেজাকে সঙ্গে করে তাদের বাসায় গেলাম। অত্যন্ত সুরুচি সম্পন্ন ফ্যামিলি। বেশ অতিথি বৎসল। ড্রয়িংরুমে বসে আছি।

লায়লার ছোট বোন লায়লার একটা অ্যালবাম হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো, ভাইয়া এলবামটা দেখে সময় কাটান। আমি আসছি।

অন্যমনষ্কভাবে এলবামের পাতা ওল্টাচ্ছি। হঠাৎ একটা ছবির ওপর চোখ আটকে গেল। প্যান্ট শার্ট পরা অদ্ভুত ভঙ্গিমায় মেয়েটি পোজ দিয়েছে। কোনো মেয়ে এতো সুন্দরী হতে পারে আমার ধারণা ছিল না। পাশে রেজাকে বললাম, মেয়েটি কে?

রেজা মুখ টিপে হেসে জবাব দিল, তোর লায়লা।

নিজেকে কষে একটা গালি লাগালাম। এই মেয়েটাকে আমি প্রত্যাখ্যান করলাম কি করে! লায়লাকে দুই চোখে দেখিনি, তার ছবি দেখেই এতোদিনের সংস্কারের খোলসা ভেঙে বেরিয়ে গেলাম।

সেদিন থেকে আমার ধ্যান-জ্ঞান সবই ওই লায়লা। কিন্তু যাকে নিষ্ঠুর আঘাতে সরিয়ে দিয়েছি তাকে কাছে ডাকি কি করে? সংস্কারের খোলস ভাঙলেও লজ্জার খোলস ভাংতে পারলাম না।

এরপর থেকে ও বাড়ি নিয়মিত যেতাম। সে কয়েকবার ছুটিতে বাড়ি এলে আমার সঙ্গে দেখাও হয়েছে। কিন্তু কোনো এক অভিমানে সেও আমার সঙ্গে নিষ্ঠুর খেলায় মেনে উঠলো। কথা বল তো দূরে থাক ঘুরেও দেখতো না।

আমি অপমানিত হয়ে তাকে ভুলে যাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বৃথাই চেষ্টা।

একদিন শুনলাম ১০ মার্চ লায়লার জন্মদিন অনুষ্ঠান। মনে মনে সুপ্ত বাসনা, এবার হয়তো প্রিয়ার মান ভাঙবে। কিন্তু না, সবাই কার্ড পেল আমি বাদে।

এমনি করে পার হয়ে গেল আরো দুটি বছর। তারপর এক সময় তার বাবার বদলির অর্ডার এলো। চলে গেল অন্যত্র। চলে যাবার দিন একান্তভাবে কিছু শুনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে আমার সমস্ত গর্বকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো।

গাড়ি ছাড়লো, আমি ঠায় দাড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ জানালার বাইরে তার মুখ দেখলাম। দুই চোখে দুফোটা অশ্রুত টলমল করছে। আমি কি ভুল দেখলাম? আমারো দুই চোখ জ্বালা করে উঠলো।

তারপর কেটে গেছে অনেকটা দিন। কালের স্বাভাবিক নিয়মে তার কোনো খবর না পেয়ে ভুলতে বসেছি সব কিছু। হঠাৎ বাড়ির লেটার বক্সে একদিন একটা চিঠি পেলাম আমার নামে। প্রেরকের স্থানে লায়লার নাম লেখা। চিঠিটা তাড়াতাড়ি খুলে পড়তে লাগলাম।

প্রিয় কায়েস

তোমার চোখে যেদিন আমার প্রতি ভালোবাসা দেখতে পেলাম সেদিন নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মেয়ে মনে হয়েছিল। কিন্তু অভিমান আর কষ্টে বুকটা ভরে গিয়েছিল। তোমার প্রত্যাখানে কাদিনি। তবে তোমার ভালোবাসা পেয়ে গোপনে অনেক্ষণ কেদেছি। আমার কষ্টটা তোমার মধ্যে ছড়িয়ে দিতেই নীরব থেকেছি। আজ তোমার লায়লার বড় বিপদ। আগামী ২০ তারিখ আমাকে আংটি পরাবে। তার আগেই তুমি কি আমার বাবা-মায়ের সামনে এসে দাড়াতে পারো না? আমি কি তোমাকে ছাড়া অন্য কারো ঘরে গিয়ে বাচতে পারি?

ইতি -

তোমার লায়লা

আজ ২৫ তারিখ। তার মানে দেশের ডাক ব্যবস্থার বদৌলতে ইতিমধ্যে পাচ দিন পার হয়ে গেছে। বাড়িতে বলে সবাইকে রাজি করিয়ে দুলাভাইদের পাঠালাম। তারা ফিরে এসে যা বললেন তাতে হতাশা ছাড়া কিছুই পেলাম না। মেয়েকে আংটি পরানো হয়েছে। বিয়ের ডেট, এমনকি কার্ডও ছাপানো হয়ে গেছে। ফলে এখন আর কোনো উপায় নেই।

বুকটা থরথর করে কেপে উঠলো আমার ...।

কাধে কারো হাতের স্পর্শে আমার কলমটা হঠাৎ থেমে গেল।

পেছনে চেয়ে দেখি লায়লা ঘুম ঘুম চোখে দাড়িয়ে আছে। দুই হাত দিয়ে আমাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে বললো, এতো রাতে বিছানা থেকে উঠে এসে কি লিখছো?

বললাম, তোমার–আমার ভালোবাসাটুকু যায়যায়দিনের পাঠকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই।

সে বললো, বাকিটুকু পরে লিখো। এখন ঘুমুবে চলো। তুমি পাশে নেই দেখে ঘুম ভেঙে গেল।

পাঠক, লায়লা শেষ পর্যন্ত আমারই বৌ। এবং এটা কি করে সম্ভব হয়েছে সে কাহিনী আরেক দিন বলবো।

ঠিকানা বিহীন

একজন হতভাগ্য স্বামীর কথা

পার্ট- ২

গত বছর ভালোবাসা সংখ্যায় আপনারা পড়েছিলেন *একজন হতভাগ্য স্বামীর কথা*। জানি না নির্মম বাস্তব আপনাদের কেমন লেগেছিল? বিবাহিত জীবনে নিজের স্ত্রীর সেক্স পার্টনার থাকার কথা জানার পরও আমরা যারা হিন্দু বিবাহিত যৌথ পরিবারের স্বামী, অনেক ক্ষেত্রেই তাদের কিছুই করার থাকে না। মাঝে মধ্যে স্ত্রীর আচরণ সন্দেহমূলক বলে মনে হলেও সংসারে অশান্তি সৃষ্টি হবে বলে কিছুই করতে পারি না।

কি–ইবা করার আছে! গত সংখ্যার শেষে আমি লিখেছিলাম আমরা এখন সুখী।

আসলেই কি আমরা মনের দিক থেকে সুখী?

মুখে যে যাই বলুক না কেন, স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ক জানার পর কেউ কখনো সুখী হতে পারে না।

সুখী থাকার চেষ্টা করেছিলাম আমি। কিন্তু প্রকৃত অস্বস্তিতে থেকে কেউ কখনো সুখী হতে পারে না। আমি এখনো বুঝে উঠতে পারি না, আমার স্ত্রী কেন এমন ভুল কাজ করলো বা করতে পারলো। আমাদের মতো যৌথ হিন্দু পরিবারে যুবক ভাতিজা বা ভাগ্নে তো থাকতেই পারে। ভাতিজা হচ্ছে ছেলের মতো। যৌবনের শুরুতে ভাতিজা একটু ভুল পথে পা বাড়াতে পারে, কাকিমা হয়ে আমার স্ত্রী কেন যে ভাতিজার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুললো তা এখনো বুঝতে পারি না। আমার সংসারের এ লজ্জার কথা আমি কাকে বলবো? এটা কি বলার মতো কথা। যে ঘটনা আমাকে প্রতিনিয়ত কষ্ট দেয়, বেদনা দেয়, আমাকে মনে করিয়ে দেয় যে, আমার স্ত্রী অসতী। এ ঘটনা কি ভুলে যাবার? তারপরও আমি হিন্দু। লোক লজ্জার ভয়ে আমাকে নীরবে–নিভৃতে সংসার করতে হচ্ছে।

মনে হয় বেশি দিন বাচবো না। এসব দুঃশ্চিন্তায় মাঝে মধ্যে আমার প্রেশার বেড়ে যায়। এ ঘটনায় তো কোনো স্বামী স্বাভাবিক থাকতে পারে না। আচ্ছা, আজ থেকে তিন বছর আগে যদি আমার স্ত্রীকে অসতী করার জন্য ভাতিজাকে খুন করতাম তাহলে কি হতো? আইনের চোখে খুনি হয়ে চিরদিন থাকতাম। কিন্তু এখন মনে হয় নিজে খুব আত্মিক তৃপ্তি পেতাম।

বিশ্বাসঘাতককে চোখে চোখে দেখার চেয়ে খুন করে জেলে থাকা বা ফাসিতে ঝোলার মধ্যেও এক ধরনের শান্তি আছে।

প্রিয় পাঠক, আইনের চোখে আমি অপরাধী হলেও নিজেকে সান্ত্বনা দিতাম প্রতিশোধ নিয়েছি।

তা করতে পারলাম না। ভালো থাকার চেষ্টা করে চলেছি মাত্র। হয়তো এভাবেই তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাবো। বুকের মধ্যে যে পরিমাণ কষ্ট জমে আছে, মনে হয় না আগামী বছর পাঠকের জন্য কিছু লিখতে পারবো।

আমার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আমার মতো হতভাগ্য স্বামীর ঘটনা পৃথিবীতে যেন না ঘটে। বিবাহিত জীবনে কোনো স্বামীকে যেন তার প্রিয়তমা স্ত্রীর ব্যভিচারী পাপের সাক্ষী থাকতে না হয়।

পরিশেষে গত সংখ্যায় যা চেয়েছি এই সংখ্যায়ও তা-ই চাচ্ছি। আপনারা আমাদের জন্য আশীর্বাদ করবেন। এক পাহাড় কষ্ট বুকে নিয়েও যেন ভালো থাকতে পারি।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রেমালাপ

– মোহাম্মদ নুরুজ্জামান খোকন

প্রেমিকা : তুমি আমাকে কেমন ভালোবাসো?

প্রেমিক : আমি তোমাকে সূর্যের মতো ভালোবাসি।

প্রেমিকা : সূর্য তো ডুবে যায়, অস্থায়ী।

প্রেমিক : তাহলে সাগরের মতো ভালোবাসি।

প্রেমিকা : কিন্তু, সাগর তো ছুটে চলে।

প্রেমিক : তোমাকে আকাশের মতো ভালোবাসি।

প্রেমিকা : আকাশে যে মেঘ জমে।

প্রেমিক : তবে আগুনের মতো ভালোবাসি।

প্রেমিকা : আগুন যে শুধু জ্বালায়, পোড়ায়।

প্রেমিক : এবার মধুর মতো ভালোবাসি।

প্রেমিকা : তবে যে পিপড়া হামলা করবে।

প্রেমিক : তোমাকে নায়িকার মতো ভালোবাসি।

প্রেমিকা : ওরা তো অভিনয় করে মাত্র।

প্রেমিক : আমি টাকার মতো পেয়ার করি।

প্রেমিকা : টাকা তো হাতের ময়লা।

প্রেমিক : তোমাকে কাকের মতো মহব্বত করি।

পেমিকা : ছিঃ, তুমি এতো খারাপ।

প্রেমিক : তাহলে আমি তোরে ঘৃণা করি, থুথু দিই।

প্রেমিকা : তার মানে? এসব কি বলছো?

প্রেমিক : চুপ, একটা কথাও বলবি না।

প্রেমিকা : তোমার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রেমিক : তোর মতো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে আমার বয়েই গেছে।

সাভার, ঢাকা থেকে

নিয়তি

- ফাহমিদা রহমান রিআ

সিকিউরিটি জিপ-এ টহল দিতে গিয়ে খুব অবাক হলো গামদি। তিনশ এক নাম্বার বাড়ির পার্কিংয়ে গতকালের মতো আজও ভলভো গাড়িটি দাড়িয়ে। তিনশ দুই নাম্বার বাসাটি তার নিজের অ্যালটমেন্টের। তাই সে খুব

ভালোভাবেই জানে বেশ কয়েকমাস থেকে তিনশ এক নাম্বার বাসটি রিপেয়ারিংয়ের জন্য কারো নামে অ্যালটমেন্ট হয়নি এখনো।

আমান আল সিনাইয়াহ–এর ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি পেট্রোল গার্ড গামদি–র পেশাগত কর্তব্যের কারণে ব্যাপারটি দৃষ্টি এড়ায় না। কিন্তু এদিক–ওদিক তাকিয়ে গাড়ির চালককে চোখে পড়লো না। পর পর কয়দিন খেয়াল করে যখন পুনরাবৃত্তি ঘটলো না তখন ভাবনাটা তেমন আমল দিল না আর। কোনো বাসার আত্মীয়স্বজনও হতে পারে। নাম্বার ভুল করে গাড়ি পার্কিংয়ের পর বাসা খুজেছে হয়তো বা। পর পর দুদিনই? যাকগে কব্জি উল্টে রিস্টওয়াচে সময় দেখে গামদি। কিছুক্ষণ পরই লাঞ্চ আওয়ার।

বাসার কাছাকাছি টহল দিতে গেলে তার স্ত্রী উদিয়ানের কথা মনে পড়ে যায় স্বাভাবিকভাবে। কিন্তু কখনোই সে কর্তব্যের ফাক গলিয়ে মনকে প্রশ্রয় দেয় না। অফিস কামাই কিংবা অফিস টাইমের হেরফের তার চাকরির তিনটে বছরে কখনোই ঘটতে দেয়নি। বছর খানেক হলো বিয়ে করেছে সে তাদেরই পাশের শহর বাহাতে। তার নিজের শহরের নাম বেনজোরশি। চাকুরি সূত্রে আসতে হয়েছে অনেক দূরে এক ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল শহরে। অবশ্য উদিয়ানকে কোয়ার্টারে আনার পর বেশ কেটে যায় দিন গামদির।

অফিস টাইমটা বাদ দিয়ে বাকি সময়টুকুর সবটাই গামদির। অফিস টাইমটা বাদ দিয়ে বাকি সময়টুকুর সবটাই সে উদিয়ানকে সঙ্গ দেয়। রান্নায় সাহায্য করা, কার্পেট ভ্যাকুয়াম করা, শপিংয়ে যাওয়া একই সঙ্গে সম্পন্ন করার পর ক্যাসেটে, সিডিতে হাসির ফিল্ম দেখে কিংবা স্যাটেলাইটের বিভিন্ন চ্যানেলের বৈচিত্র উপভোগ করে এক সঙ্গে। উদিয়ানের কাজে সাহায্য আর অফিস আওয়ারের নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্য খাদেমা অর্থাৎ কাজের মেয়ের ব্যবস্থা করতে চেয়েছে গামদি। উদিয়ান বাধা দিয়ে বলেছে, *মাফি মুস্কিলা* (কোনো অসুবিধা নেই)।

অহেতুক থার্ড পারসন তার পছন্দনীয় নয়। আসলে উদিয়ান খুব শান্তপ্রিয় মেয়ে। এই এক বছরে গামদি কখনোই উদিয়ানের রাগ অভিমান কিংবা কোনো বায়না ধরতে দেখেনি।

উইকএন্ডে গামদি বেরিয়ে পড়ে উদিয়ানকে নিয়ে লং ড্রাইভে উদ্দেশ্যহীনভাবে বহুদূরে। হাইওয়ের দুপাশের ধুধু মরুভূমির প্রান্ত ছাড়িয়ে সুউচ্চ পর্বতমালার কাছাকাছি গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ে। বিশালাকায় পাথর ছড়ানো মরু প্রান্তরে খোলা আকাশের মুক্ত হাওয়ায় শ্বাস নেয় বুক ভরে। গাড়ির ডিগি খুলে গামদি বের করতে থাকে তাদের সংসারের কিচেনটাই যেন।

উদিয়ান বিছিয়ে নেয় কার্পেট। পাথরের গা ঘেষে সাজায় লম্বাটে তাকিয়া। আয়েস করে বসে গামদি। ফ্লাস্ক থেকে ছোট কাপে গলায় *গাওহা* ঢালে কিছুক্ষণ পর পর।

প্রকৃতির শুদ্ধতায় এক সময় ক্ষিধে জানান দেয়। রেডিমেড খাবারের প্যাকেট খুলে ডিসপোজেবল গ্লাস–প্লেট–চামচ সাজায় উদিয়ান।

কখনো লাহামমন্দি, কখনো গ্রিল মুরগি সহযোগে লাল ভাত দিয়ে ভূরিভোজনটাও হয়। গামদি গা নড়াও দেয় ঢেকুর তুলে।

উদিয়ান তখন মাথার ওপর খোলা আকাশ দেখে একাগ্র চিত্তে।

দিন শেষে তারা আবার ফেরে চার দেয়ালের সেন্ট্রাল এসির কৃত্রিম আবহাওয়ায়। পরবর্তী কোনো সপ্তাহান্তে ছোটে সমুদ্রের নীলের কাছে। ব্রোস্টের প্যাকেট খুলে খেতে খেতে সি বিচের সীমানায় বসে দূরে ভেসে যাওয়া মস্ত তেলবাহী জাহাজ দেখে। গামদি শোনায় স্বপ্নের কথা উদিয়ানকে, কোনো এক লম্বা ছুটিতে তারাও ঘুরবে দেশান্তরী হয়ে। উদিয়ানের নেকাব ঢাকা চোখ দুটিতে খুশির ঝিলিক খেলে কি না দেখা যায় না। এভাবেই দিন গড়ায়, গড়িয়ে যায়।

আবারও টহলের ফাকে দূর থেকে সেই গাড়িটি সেখানেই চোখে পড়ে। পৌছতে না পৌছতেই শা করে বেরিয়ে যায় গাড়িটি পাশ কাটিয়ে। পেশার দায়িত্বেই এবার সিরিয়াসলি নেয় গামদি। কে ও? বন্ধ বাসার পার্কিংয়ে কেন?

পরদিন ওৎ পেতে থাকে দেখতে পায় সেই ভলভো গাড়িটি নির্ভুলভাবে তিনশ একের বাসার পার্কিং-এ থামে। চালক নেমে নির্দ্বিধায় কয়েক পা হেটে এগিয়ে যায়। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে দেখতে পায় পাশের তিনশ দুই নাম্বার বাসার ডোরবেলে হাত রাখে।

এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় গামদির মাথা দুলে ওঠে, ঘোর লাগা দৃষ্টিতে দেখে তার নিজের বাসার ভেতরের লক খুলে যায়, অন্দরে আড়াল হয় আগন্তুক। তার মানে ...?

গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে মাথা এলিয়ে পরমুহূর্তে এক ঝটকায় মাথা তুলে গামদি। ভালো করে না জেনে অধৈর্য হওয়া ঠিক নয়। ধীরে ধীরে টহল দেয় একদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে। অবশেষে আগন্তুক তেমনি কয়েক পা এগিয়ে গাড়িতে ওঠে। গামদিও পিছু নেয় আগন্তুকের। এক সময় জেনে যায় আগন্তুকের ঠিকানা।

অজানা রহস্য উন্মোচনে মরিয়া হয়ে ওঠে গামদি। বিভিন্নভাবে সবটুকু তথ্য উদ্ধার করে। কখনো বা আগন্তুকের কর্মস্থলের কোনো কর্মীকে সুচতুরভাবে আয়ত্বে এনে, কখনো বা ছুটেছে বেলজোরশি নিজ বাড়িতে, কখনো বাহাতে।

তথ্যের প্রমাণাদি নিয়ে পরিষ্কার দেখতে পায় গামদি তার স্ত্রী উদিয়ানের বিয়েপূর্ব প্রণয়গাথা। খুব ছেলেবেলায় পাশাপাশি বাড়ির দুই ছেলেমেয়ে ওতাইবি আর উদিয়ান সমবয়সী খেলার সঙ্গী ছিল। উদিয়ান বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে বোরখা আর নেকাবে আড়াল হলো সামাজিক রীতি অনুযায়ী। কিন্তু ওতাইবির মনের আয়নায় একটুও ঢাকা পড়লো না খেলার সঙ্গী উদিয়ান। সবার চোখের আড়ালে উদিয়ান-ওতাইবির টেলিফোন যোগাযোগ চলতো প্রতিটি বিষয়ে। এমনকি ওতাইবি যখন আমেরিকায় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যায় তখনো যোগাযোগের নিয়মিত মাধ্যম ছিল এই টেলিফোন।

এরই মধ্যে অভিভাবকদের আদেশ মেনে উদিয়ানের বিয়ে হলো।

ওতাইবি জানালো, কোনো চিন্তা নেই। দুজনে ঠিক থাকলে সব ঠিক থাকবে। নীরবে সময়টুকু পার করো শুধু উদিয়ান। এছাড়া আমাদের উপায় নেই সাময়িকভাবে।

সেই মতো গামদির স্ত্রী হয়ে উদিয়ান বাহা থেকে বেলজোরশি এবং পরে এ শহরে এসেছে। গত ছয় মাস আগে ওতাইবি পড়া শেষ করে দেশে ফিরেছে। নিজ শহরে চাকরির অফার ফিরিয়ে সন্ধান করেছে উদিয়ানের শহরে। মিলেছেও সেখান থেকে কিছুটা দূরত্বে একটি প্রাইভেট ফার্মে ইঞ্জিনিয়ারের পদে। শিফটিং ডিউটি ওতাইবির। উদিয়ানের সঙ্গে যোগাযোগের ধারা বজায় রেখে গামদির কর্মদিবসের সুযোগ নিয়ে অনুপস্থিতিটা ওদের পুরনো প্রণয় চাঙা করে তোলে দিনের পর দিন। ওতাইবি নিজেকে তৈরি করে চলেছে আবার আমেরিকায় ফিরে যাবার জন্য। সেখানে সেটেলড হবে উদিয়ানকে নিয়ে।

পালিয়ে যাবার প্রস্তুতির ভয়ংকর তথ্যটাও গামদি জানলো।

সব কিছুই ঘটলো অতি নিপুণভাবে।

উদিয়ান-কে এর ছিটেফোটাও বোঝার সুযোগ দেয়নি গামদি পাছে ওরা সাবধান হয়ে নাগালের বাইরে হারিয়ে যায়! তাই ঘরে ফিরে গামদি সুচতুর অভিনেতার মতো অভিনয় করতো ভেতরের বিষ ভেতরে রেখেই। আর উদিয়ান! স্বভূমিকায় তেমনি অপরিবর্তনীয়।

অবশেষে গামদি শেষ প্রমাণটাতেও অবতীর্ণ হলো। ওতাইবির ডিউটি বুঝে অপেক্ষায় রইলো। ওতাইবির গৃহে প্রবেশ এবং নিষ্ক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলো। ওতাইবির ভলভো যখন চোখের আড়াল হলো, নিজ বাসার ডোরবেলে হাত রাখলো গামদি। উদিয়ান দরজা খুলে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো।

আমতা আমতা করে বললো, *আল হীন এনতা?* (তুমি এখন?)

গামদিও গভীর দৃষ্টি ছুড়ে বললো, লেস? (কেন?)
উদিয়ান মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো, *সালামাতাক?* (কুশল আছো তো?)
গামদি জবাবে কিছু একটা বলতে গিয়ে নিজেকে সংবরণ করলো। একবার ভাবলো, আর নয়, এ মুহূর্তেই উদিয়ানকে চরম শাস্তি দেবে তার পবিত্র ভালোবাসার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার। পরক্ষণেই ভাবলো, তাহলে যে দোষীকে ধরা যাবে না আর।
ওতাইবি অন্যবারের মতো তার ভলভোটিকে ফাকা বাড়ির পার্কিংয়ে রেখে অন্দরে আড়াল হতেই গামদি তার টহলরত গাড়িটি থেকে নামলো। এগিয়ে এলো নিজ বাড়ির সামনে। পকেটে আগ্নেয়াস্ত্রটির অবস্থান শেষবারের মতো পরীক্ষা করে নিল। ডোরবেল টিপতেই উদিয়ানের কণ্ঠ ভেসে এলো। কিন্তু খুলতে এলো না। মুর্হুমুর্হু বাজতে থাকলো বেল।
উদিয়ান *মীন? মীন?* (কে? কে?) বলে সাড়া দিল প্রতিবারই। গামদি বুঝলো উদিয়ান সময় নিচ্ছে ভেতরের লুকোচুরির।
লাথি কষতে লাগলো গামদি বারবার।
দরজা খুলে দেয়াল ঘেষে দাড়ালো উদিয়ান।
গামদি আগ্নেয়াস্ত্র উচিয়ে পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলো, *জেন রেজজাল, ফেন?* (কোথায়? কোথায় সে?)
ঠিক সেই মুহূর্তে গামদির চোখে পড়লো কিচেনের জানালার ওপারের বাউন্ডারি ওয়াল টপকে পালাচ্ছে ওতাইবি। ট্রিগারে একটা চাপ দিল গামদি। লক্ষ্য ঠিক। আর্তচিৎকারসহ নিস্তেজ দেহটা গড়িয়ে পড়লো। উদিয়ানের পানে চাইলো গামদি। থর থর করে কাপুনি দেয়া হাতটি ধরে টেনেহেচড়ে দাড় করালো ওতাইবির পড়ে থাকা দেহটির পাশে। উদিয়ানের মাথা লক্ষ্য করে আরো একটি গুলি। পরে গেল উদিয়ান ওতাইবির কাছেই। ধীর পায়ে টলতে টলতে ঘরে ঢুকে ফোনটা তুলে নিল গামদি। ডায়াল করলো, হ্যালো পুলিশ। টু মার্ডারস। কাম প্লিজ, ভিলা নাম্বার থ্রি হানড্রেড টু।
অবসন্ন দেহটি সোফায় এলিয়ে আগ্নেয়াস্ত্রটি ছুড়ে দিল মেঝেতে। হঠাৎ ডুকরে কেদে উঠলো, এটার প্রয়োজন নেই আর।
সে ভাবলো, আমার ভালোবাসার অবমাননার বিচার নিজ হাতে করেছি। এবার আমার বিচারের ভার আইনের হাতে তুলে দিলাম।

সউদি আরব থেকে

এক নিমেষে

– অনিরুদ্ধ বিশ্বাস

সেদিনটি ছিল ভালোবাসা দিবস। বেলা এগারোটায় ইউনিভার্সিটিতে রেজির আসার কথা। ভাবছিলাম গিফট হিসেবে কি দেয়া যায় রেজিকে। বুকের ভালোবাসা ছাড়া তো কিছু দেয়ার নেই। তবুও সৌজন্যমূলক কিছু একটা দেয়া চাই। সিদ্ধান্ত নিলাম ওকে একগুচ্ছ লাল গোলাপ দেবো। কারণ টুকটুকে লাল গোলাপ ও খুব বেশি পছন্দ করে।
ফুলের দোকান থেকে চারশ টাকার একটা তোড়া নিলাম সযত্নে। বার বার ভাবছি এর ফুল পেলে রেজি কতোই না খুশি হবে। খুশি হলে ও আমার হাত শক্ত করে চেপে ধরে। তখন আমার খুব আনন্দ হয়। মনে হয়, সারা বিশ্ব জয় করে ফেলবো আমি। আমার কিছু না থাক, আমার সঙ্গে আমার ভালোবাসা তো আছে।
পৌনে এগারোটায় ইউনিভার্সিটি এসে পৌছালাম। রেজি এখনো আসেনি। লাইব্রেরির সামনে ওর দাড়িয়ে থাকার কথা। ওখানে এক দেবদারু গাছের নিচে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। সময় বেড়ে চললো। এভাবে ফুল

নিয়ে একা ক্যাবলাকান্ত হয়ে দাড়িয়ে থাকা পীড়াদায়ক। তবু প্রতীক্ষা করছি। ঘড়ির কাটা যখন জানিয়ে দিল একটা বাজতে চলেছে তখন রেজির জন্য আমার রাগ নয়, দুশ্চিন্তা হলো। ওর কোনো দুর্ঘটনা হলো না তো। আজকাল রাস্তাঘাটের যা অবস্থা তাতে যে কোনো সময় দুর্ঘটনার শিকার হওয়া মোটেও অস্বাভাবিক নয়।
রেজিকে নিয়ে অশুভ আশঙ্কায় যখন অস্থির তখন দেখলাম রেজি একটা কালো মারুতি থেকে নেমে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। ওকে দেখে মনে মনে স্বস্তি পেলাম। যাক, কোনো দুর্ঘটনা হয়নি তাহলে। হালকা নীল শাড়ি, নীল ব্লাউজ ও টিপে ওকে দারুণ দেখাচ্ছিল।
ও এসেই সরাসরি বললো, তোমার হাতে ওসব কি?
ফুল।
ফুল! ফুল কেন?
আজ ভালোবাসা দিবস। তাই তোমার জন্য এনেছিলাম।
রেজি ফুলগুলো আমার হাত থেকে নিয়ে ছুড়ে ফেললো পাশের নর্দমায়।
রেজির ব্যবহার দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলাম।
রেজি বললো, আমাকে তুমি ভুলে যাও। ভেবে দেখলাম তোমাকে বিয়ে করা মানে একটা অনিশ্চিত জীবনের সাথে জড়ানো। কি দিতে পারবে তুমি? ওই সব ফুলের আজকাল কোনো দাম নেই। ওই গাড়িতে যিনি বসে আছেন, কয়েকদিন পর তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি। তিনি আজ কতো বিদেশি খাবার খাওয়ালেন। এই দেখো, এ আংটিও তিনি আজ উপহার দিলেন।
কথাগুলো বলে চলে গেল রেজি।
আমিও হতবাক হয়ে পিছু ডাকতে পারিনি। প্রথম দিকে ঘটনাটা মেনে নিতে পারিনি, শুধু টেনশনের অবসানে সিগারেট ধ্বংস করতাম। ভাবতাম, এতোদিনের ভালোবাসা শুধু স্বার্থের জন্য এক নিমেষে শেষ হয়ে গেল। কিন্তু বহুদিন পর হলেও বুঝেছি ভালোবাসা বুকে থাকে না, থাকে চায়নিজ রেস্টুরেন্ট, মানিব্যাগ কিংবা হীরের আংটিতে।

মহারাজপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে

গল্পের গল্প

রুবন বিন রানিয়া

অফিসে আজ বেশ খাটাখাটনি গেছে। খাটনি হবেই বা না কেন? যদি হাবিব নামে খাটাশ শ্রেণীর বস আর রফিক নামের গিরগিটি টাইপের অধস্তন কর্মচারী থাকে তবে জীবনটা চটপটি না হলেও নিদেনপক্ষে লটপটি তো হবেই।
হাবিব আর *রফিক* দুটো নামের অর্থ *বন্ধু* হলেও আমার জীবনে এ দুই নামের যতো লোক দেখিছি তার বেশির ভাগই বদলোক। কাউকে কখনো বন্ধু হিসেবে পাইনি। এটা অবশ্য আমার কপালের দোষ। কপালের না হলেও অন্তত রাশির দোষ বলা যেতে পারে। না হলে এ দুই নামের যে, সব ভালো মানুষেরা আছে তাদের দেখা পাওয়ার সৌভাগ্য আজ পর্যন্ত হলো না কেন?
যাক, সেসব কথা না হয় আরেক দিন হবে। একে তো সারা দিনের শ্রান্তি–ক্লান্তি তার ওপর শীতের রাত। আমি বেচারা এখনো ব্যাচেলর। তাই *একটু উষ্ণতার জন্য কম্বলখানাই মোর সম্বল*। সেটির আলিঙ্গনেই নিজেকে সপে দিয়ে নিদ্রাপরীর গভীর প্রেমের অতল তলে পরম সুখে হারিয়ে গিয়েছিলাম।
কিন্তু সর্বনাশা টেলিফোনের রিং টোনে আমার সুখ নিদ্রা ভেঙে খান খান হয়ে গেল। নিদ্রাজড়িত কণ্ঠেই বললাম, হ্যালো।
অপর পারের বেরসিকজন নিজে হেললো কি না জানি না। তবে আমাকে রীতিমতো দাড় করিয়ে ছাড়লো।

হ্যালো দোস্ত, তুই কি ইলিশ মাছ রান্নার রেসিপি জানিস?

না, জানি না। তুই ক্যা ক্যা ঢেরবেশী বা বিদূষিকা কবিরকে ফোন কর।

তোর কাছে কি ওদের ফোন নাম্বার আছে?

না, নেই। তুই এক কাজ কর। আমার কাছে ঘ্যান ঘ্যান না করে *চ্যানেল খাই* অথবা *নন্দু* টিভি-তে যোগাযোগ করে ওদের ফোন নাম্বার কালেক্ট কর। রাখি দোস্ত। আমি খুব টায়ার্ড। ঘুমাই। বাই।

আরে থাম না শালা। তুই হাবিবের সাথে থেকে থেকে ওর মতোই ছোটলোক হয়ে যাচ্ছিস দিনে দিনে। আমার তো কথাই শেষ হয়নি। তোর কাছে নন্দু টিভি-র ফোন নাম্বার আছে?

না। এক কাজ কর। বিদূষিকা কবিরের অ্যাসিস্টান্টকে ফোন কর।

ওর ফোন নাম্বার আছে তোর কাছে?

না রে দোস্ত, নেই। তুই পেলে আমাকেও নাম্বারটা দিস। রাখি, কেমন?

আরে শালা। এতো রাখি রাখি করছিস ক্যান?

তোর হয়েছে কি, বল তো?

ও হাউমাউ করে কেদে দিয়ে বললো, দোস্ত, আর বলিস না। তোর ভাবী আজ আমার সঙ্গে রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছে।

আরে বৌ তো রাগ করে বাপের বাড়ি যাবেই। এ আর নতুন কি? এটাই তো বৌয়ের ধর্ম। যতোদিন বৌদের বাপের বাড়ি থাকে ততোদিন একটু ছুতো পেলেই রাগ করে বাপের বাড়ি যায়। যদি ছুতো না পায় তবে পায়ে পাড়া দিয়ে ঝগড়া বাধিয়ে চলে যাবে। এতে নার্ভাস হওয়ার কিছুই নেই। কাদিস নে। দেখিস সময় মতো ঠিক ঠিক ফিরে আসবে।

না রে দোস্ত। এ যাওয়া সে যাওয়া না। একবারের অগস্ত্যযাত্রা। কোনোদিন নাকি আর ফিরবে না।

ধুর শালা! তুই এখনো একটা রামছাগলই আছিস। আরে সব বৌরাই রাগ করে বাপের বাড়ি যাওয়ার সময় একই কথা বলে। আরে নাটক সিনেমায় দেখিস না, আত্মহত্যা করার আগে সবাই লিখে যায় *আমার মৃত্যুর জন্য কেউ-ই দায়ী নয়।*

ও কান্না জড়িত কণ্ঠে বললো, দোস্ত, তোর কি ধারণা ও আত্মহত্যা করতে পারে?

আরে শালা। কথার কথা বললাম। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না ভাবীর চলে যাওয়ার সঙ্গে *ইলিশ মাছ, ক্যা ক্যা ঢেরবেশী, নন্দু টিভি, চ্যানেল খাই* এসবের সম্পর্ক কি?

দোস্ত, তোর ভাবী আমাকে ভাতে মেরেছে, পানিতে মেরেছে। রেফ্রিজারেটর যে রান্না করা খাবার ছিল তা শেষ। আমি এখন খাবো কি? ডিপ রেফ্রিজারেটর কাচা ইলিশ আছে। কিন্তু রাধবো কি করে? এদিকে ক্ষিধেয় পেটের মাঝে রাক্ষস-খোক্ষস সব খাই খাই করছে। মনে হচ্ছে কাচা ইলিশই চিবিয়ে খাই।

আমার বন্ধু আবার রামপেটুক। খাওয়া ছাড়া কিছুই বোঝে না। ওর যে কি পরিমাণ কষ্ট হচ্ছে তা বুঝতে আমার কোনো কষ্ট হলো না। তাই ওর প্রতি বেশ অনুশোচনা হলো। বললাম, দোস্ত, এতো রাতে তো হোটেল টোটেল খোলা পাবি না। তার চেয়ে বরং এক কাজ কর। ইন্টারনেটে *ডাবলিউ ডাবলিউ ক্যা ক্যা ঢেরবেশী ডট কম* কিংবা *ডাবলিউ ডাবলিউ বিদূষিকা কবির ডট কম* লিখে ওয়েব সার্চ টিপে বেটা কম্পিউটারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বসে থাক। এ নামে কোনো ওয়েবসাইট থাকতেও পারে। যদি না থাকে তখন কম্পিউটারই খুজে-টুজে আসল অ্যাড্রেস বের করে দেবে। তখন তুই ওই সব ওয়েবসাইটে ইলিশের রেসিপি পেয়েও যেতে পারিস। ঠিক আছে সোহেল। দোস্ত, তুই ইলিশের রেসিপি খোজ। আমি ঘুমালাম।

আমি ঘুমোতে চাইলেও ঘুমোতে পারলাম না।

হঠাৎ টেলিফোনের বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। রিসিভার কানে দিয়ে যা শুনলাম তাতে এবার শুধু ভাঙা না, রীতিমত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। আমার বন্ধু সোহেল খাবারের সন্ধানে হোটেল খুজতে গিয়ে পুলিশের চোখে সন্দেহজনক চালচলনের জন্য ধরা খেয়েছে। ও এখন থানায়।

কাতর কণ্ঠে আমাকে থানা গিয়ে ওকে ছাড়িয়ে আনার জন্য কাকুতি মিনতি করলো।

বিপদেই বন্ধুর পরিচয় দিতে থানায় গিয়ে ওকে ছাড়িয়ে আনলাম। পরে ওর মুখ থেকে বিস্তারিত বিবরণ শুনলাম।

আমার বন্ধুটার লেখালেখির বাতিক আছে। কিন্তু তার ভাগ্য মান্না দে-র সেই কফি হাউসের অমলের মতো। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় গল্প, কবিতা পাঠায়। কিন্তু কেউ তার প্রতিভার দাম বোঝে না। বেশি বড় মাপের লেখক হলে যা হয়? গতানুগতিক ধাচের লেখা না হলে সম্পাদকরা তা *অখাদ্য* বলে মনে করে। সাধে কি আর নজরুলকে এতো *গলদঘর্ম* করে তার সৃষ্টিকে আলোর মুখ দেখাতে হয়েছিল! নজরুল কেন, বিশ্বের সব বড় কবি, লেখদেরই তো একই অবস্থা।

আমি ওকে একদিন *যায়যায়দিন*-এর বিশেষ সংখ্যায় লেখা পাঠানোর পরামর্শ দিলাম। একমাত্র ওই পত্রিকাকেই *রাইটার মেকার* বলা যেতে পারে। অন্যান্য পত্রপত্রিকা শুধু তেলা মাথায় তেল দেয়। কিন্তু আতেল মাথায় ঘষা দিয়েও যে তেল বের আনা যায় তা কারো জানা ছিল না। সেই তত্ত্ব আবিষ্কার করল *যায়যায়দিন*।

আমার বন্ধু বাজার ঘেটে *যাযাদি*-র সমস্ত বিশেষ সংখ্যা কিনে এনে স্টাডি করা শুরু করলো। কি ধরনের লেখা লিখলে ছাপানোর সম্ভাবনা আছে সে সম্পর্কে ধারণা নিয়ে একটা ভালোবাসার গল্প লিখে ফেললো। *ফেললো* বলছি এ জন্য যে, লেখাটি শেষ পর্যন্ত সম্পাদক দরবারে পৌছেনি। তাই তা ফেলেই রাখতে হয়েছিল। আর সে জন্যই সর্বনাশটা ঘটার সুযোগ পেল। লেখাটির বিষয়বস্তু হলো এ রকম :

ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় ও ওর এক খালার বাসায় লজিং থাকে। যেহেতু ভালোবাসার সিকোয়েন্স তৈরি করতে হবে, তাই সে সেখানে নবযৌবনা এবং উন্মাদনাময়ী খালাতো বোনের আবির্ভাব ঘটালো। এখন নায়ক নায়িকার মাঝে অবাধ মিলনের ব্যবস্থা করতে হবে। তাই সে নায়িকার বাবাকে চট্টগ্রামে পাঠিয়ে দিয়ে নায়িকা এবং তার জননীকে নিঃসঙ্গ করে তাদের দেখাশোনা স্কুল ছাত্রী নায়িকার পড়াশোনার দায়িত্ব নায়ক অর্থাৎ নিজের কাধে নিয়ে নিল। এভাবেই কোনো দুর্বল মুহূর্তে খালার অনুপস্থিতিতে দুজনের মাঝে চলতে থাকলো গোপন অভিসার।

যাহোক, গল্পের নায়ক নায়িকার কি ঘটলো তা আর বললাম না। পৃথিবীতে অনেক প্রতিভাবান মানুষের প্রতিভার দাম তার জীবদ্দশায় কেউ বোঝেনি। তাদের মৃত্যুর পর লোকে তা নিয়ে রীতিমতো হই চই বাধিয়েছে। আমার বিশ্বাস, আমার বন্ধুর প্রতিভারও একদিন মূল্যায়ন হবে। সেদিন তার সেই গল্প আপনারাও পড়বেন। শুধু লেখকের সেই সৃষ্টি নিয়ে তার নিজ পরিবারে কি লংকাকাণ্ড বেধেছিল তা-ই বলছি।

ও একদিন অফিস থেকে ফিরে এসে দেখে তার স্ত্রী চুপচাপ বসে আছে।

সে তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে।

কিন্তু ভাবী কথা বলেন না। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর ভাবী মুখ খোলেন। তবে রীতিমতো উকিল রূপে আবির্ভূত হয়ে সোহেলকে জেরা করা শুরু করেন, তুমি যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়তে তখন কি মিনুখালার বাসায় থাকতে?

নাতো। তবে প্রথম যে কয়দিন হস্টেলে সিট পাইনি, সেই কয়দিন ছিলাম।

তখন খালু কোথায় থাকতেন।

ঢাকায়। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন করছো?

ঢাকা, না চট্টগ্রাম? ভালো করে ভেবে বলো?

আরে, খালু তো কখনোই ঢাকার বাইরে যাননি? কিন্তু এসব কথা কেন জিজ্ঞাসা করছো লক্ষ্মীটি?

এতো কেন, কেন করো না। যা বলছি তার ঠিক ঠিক জবাব দাও। সোনালি তখন কোন ক্লাসে পড়তো?

এই ফাইভ, সিক্সে হবে হয়তো।

ফাইভ সিক্সে, না? মিথ্যা বলো না। সে পড়তো ক্লাস নাইনে। তুমি ওকে পড়াতে?

ঠিক পড়াতাম না। মাঝে মধ্যে...।

ব্যস, ব্যস। আমাকে আর বলতে হবে না সোহেল। আমি সব বুঝে গেছি। আমার কাছে এখন সব পানির মতো পরিষ্কার। ছিঃ, তুমি এতো খারাপ? চরিত্রহীন, লম্পট।

তুমি এসব কি বলছো?

ভাবী রীতিমতো অগ্নিকন্যার রূপ ধারণ করলেন। তারপর যাযাদি-র *ভালোবাসা* সংখ্যার জন্য লেখা সেই গল্পটি ওর মুখের ওপর ছুড়ে মেরে বললেন, এটা কি?

আরে এটা তো একটা গল্প।

গল্প, না? বাস্তবে না ঘটলে এমনি এমনি মাথা থেকে বের হয় এসব? আমাকে তুমি ছোট খুকি পেয়েছো? যা বলবে তাই অবলীলায় বিশ্বাস করবো? বেহায়া! ইতর! জানোয়ার! চরিত্রহীন! লম্পট! শয়তান! পুরনো প্রেমিকার কথা এখনো ভুলতে পারো না। তাই আবেগের বেগ সামলাতে না পেরে নিজের পাপের কীর্তি বসে বসে লেখো? তুমি যে কোন ঘোরের মাঝে থাকো, তা ভালো করেই জানি।

ভাবী স্টুডেন্ট লাইফে সক্রিয় রাজনীতি করতেন। তাই নিষ্ক্রিয় থাকতে পারলেন না। প্রথমে বাসার ক্রোকারি, শোপিসসহ সব ভংগুর-অভংগুর জিনিসপত্তর ভাংচুর করলেন। তারপর সোহেলের যতো লেখার খাতা ছিল সব চুলোয় পুড়িয়ে বাবার বাড়ি চলে গেলেন।

কাহিনীর বাকিটুকু সোহেল আর বলতে পারেনি। ভাবী ওকে রেখে চলে গেছেন এ কথা মনে হতেই সে হাউমাউ করে কেদে ফেললো।

ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, ঠিক আছে দোস্ত। কাদিস না, প্লিজ! সব বিখ্যাত মানুষের জীবনে এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে।

যেমন সক্রেটিস-এর কথাই ধর। সক্রেটিস তার শিষ্যদের নিয়ে তার বাসায় জ্ঞানের আসর বসাতেন। তার বৌ তার প্রতিভার মর্ম বুঝতেন না। তাই সক্রেটিসের এই আড্ডাবাজি সহ্য করতে পারতেন না। তিনি অন্য সব প্রতিভাবানদের বৌদের মতো চাইতেন, তার স্বামী যেন এসব পাগলামি বাদ দিয়ে সংসার ধর্মে মনোযোগী হন। কিন্তু সংসারের এ ক্ষুদ্র পরিসরে নিজেকে বন্দী রাখতে পারতেন না মহান সক্রেটিস। তিনি যতোই বলতেন, *পৃথিবী আমারে চায়, রেখো না বেধে আমায়। খুলে দাও প্রিয়া। খুলে দাও বাহুডোর ...*, তার প্রিয়া বাহুডোরে ততোই বড় তালা মেরে তাকে আটকে রাখতে চাইতেন। কিন্তু *প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে*।

তাই তালা যতো বড় হতো সক্রেটিস ততো বড় হাতুড়ি দিয়ে তা ভেঙে ফেলে বেরিয়ে আসতেন। তার *সং এবং সার-এর* সংসার মঞ্চ তখনই রূপান্তর হতো কুরুক্ষেত্রে।

একদিন সক্রেটিস যখন শিষ্যদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন তখন তার স্ত্রী পানি ভর্তি গামলা হাতে হঠাৎ সেই আসরে আবির্ভূত হন। সক্রেটিস ভাবলেন, পানি ভর্তি গামলা দিয়ে হয়তো তার প্রিয়তমা স্ত্রী দর্শন শাস্ত্রের কোনো নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন যা তিনি তাকে এবং তার শিষ্যদের শেখাতে এসেছেন। তিনি যুগপৎ বিস্মিত এবং আনন্দিত হলেন। মনে মনে ভাবলেন, *যাক বাবা, আমার স্ত্রী তবে আমার পথে এসেছে। এখন থেকে সহধর্মিণীর বিরোধিতার পরিবর্তে সহযোগিতা পাওয়া যাবে। মনের আনন্দে ঘরে বাইরে নির্বিঘ্নে দর্শন শাস্ত্র চর্চা করা যাবে।*

কিন্তু স্ত্রীর দার্শনিক তত্ত্ব বোঝার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এও হাড়ে হাড়ে মগজে মগজে বুঝতে পারলেন যে, গামলা ভর্তি ওই পানি ছিল অতি উত্তপ্ত। যখন তার প্রেমময়ী প্রেয়সী তা তার মাথার ওপর নির্দয়ভাবে ঢেলে দেন,

সেই দুঃখে সক্রেটিস গৃহ ছেড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেন। সেই সীমাহীন, বন্ধনহীন প্রকৃতির বুকে একাগ্রচিত্তে জ্ঞানের চর্চা করে তিনি কালজয়ী দার্শনিক *সক্রেটিস* হয়ে যান।

এ গল্প শোনার পর সোহেল কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে তো উল্টা হয়েছে।

বোঝালাম, সক্রেটিসের বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া আর তার বৌয়ের বাপের বাড়ি চলে যাওয়া একই কথা। এবং সব মনীষীর জীবন কাহিনী হুবহু এক হলে তো চলবে না। আসল জায়গায় এক হলেই হলো। আসল কথাটি হলো, বড় হওয়ার জন্য দরকার যুৎসই একখান ছ্যাকা। দেখিস না লালন, শরৎবাবু কেউ কি জীবনে বিয়ে করেছে? স্যার আইজ্যাক নিউটন তো সর্বনাশা ভুল করতে বসেছিলেন। আল্লাহ তাকে নিজ হাতে বাচিয়ে দিয়েছে। তুই ওই কাহিনী জানিসনে?

কোন কাহিনী দোস্ত?

তবে শোন। নিউটন তার প্রেমিকার হাতে বিয়ের আংটি পরাতে গিয়েছিলেন। প্রেমিকার আঙুল নিজের হাতে নিয়ে পকেট থেকে আংটি পরাতে যাবেন। এমন সময় তার একটা থিওরির কথা মনে পড়ে গেল। তখনই তিনি হারিয়ে গেলেন চিন্তার গভীর সাগরে। এবং সে সময়ই মাথায় চেপে বসলো চুরুটের নেশা। হাতের মাঝে বন্দী প্রেমিকার আঙুলকে তিনি ভাবলেন চুরুট। পকেট থেকে আংটির পরিবর্তে ম্যাচলাইটার বের করে প্রেমিকার আঙুলে আগুন ধরিয়ে দিলেন।

প্রেমিকা আর্তচিৎকার দিয়ে কোনোক্রমে নিজের আঙুল উদ্ধার করে পালিয়ে বাচলেন।

সেই থেকে বিয়ের বাজারে নিউটন হয়ে গেলেন মূল্যহীন। তার মাথা থেকেও বিয়ের ভূত গেল ছুটে।

সেদিন যদি সত্যি সত্যিই নিউটনের বিয়ে হয়ে যেতো, ভেবে দেখেছিস কতো বড় সর্বনাশই না হতো! তখন কি আর নিউটন বেডরুম ছেড়ে আপেল বাগানে ঘুমোতে পারতেন? আর মাথার ওপর আপেল কেন জ্বলজ্যান্ত একটা পাকা কাঠালও যদি কখনো পড়তো তবে সেটা কেন নিচে পড়লো সে ভাবনা না ভেবে, বৌ কাঠাল কি মুড়ি দিয়ে খাবে, নাকি দুধ দিয়ে খাবে সই ভাবনায় মুড়ি ও দুধের দোকানে ছুটাছুটি করে কূল পেতেন না। বৌয়ের গুতোয় সারা দিন মাথার মাঝে চাল, ডাল, লবণ, পেয়াজ, হলুদ, মরিচ, শাড়ি–গহনাই ঘুরপাক খেতো। দশ কেজি আপেলের বস্তা পড়েও যদি মাথায় গুতো মারতো তবে কি মগজ থেকে মাধ্যাকর্ষণের সূত্র বের হতো?

rubonbinrania@hotmail.com

ডির্ভোস লেটার

২০০০ সালের জুন মাস। অস্ট্রেলিয়ায় পড়ালেখার উদ্দেশ্যে পা বাড়াই। বাবা, মা, ভাই সবাইকে ছেড়ে এক অচেনা, অজানা দেশে যাত্রা। ভয়, কৌতূহল সব মিলিয়ে ভিন্ন এক অনুভূতি।

এক সময় পৌছে গেলাম সেই অজানা দেশে। প্রথম ছয় মাস খুবই খারাপ কেটেছিল। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মনে হতো আজই দেশে ফিরে যাবো। আমার রুমমেট আমাকে বোঝাবে কি? সেই প্রতিদিন তার মাকে ফোন করে হাউ মাউ করে কাদে। সে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি।

দেশের সবাইকে খুব মিস করতে লাগলাম। বিশেষ করে ছোট ভাইটিকে। পিঠাপিঠি হওয়াতে সব সময় এক সঙ্গেই থাকতাম। কতো ঝগড়াঝাটি সামান্য কারণে। মনে পড়লে খুব খারাপ লাগতো।

যাই হোক। ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হতে লাগলো। ডিপ্লোমা কোর্স ছেড়ে ইউনিভার্সিটিতে গেলাম। পড়ালেখার প্রচণ্ড চাপ বাড়লো। এভাবেই চলে গেল দেড় বছর।

এরপর সামারে হলিডে-তে বাংলাদেশ গেলাম। অনেক দিন পর সবাইকে কাছে পেয়ে খুবই চমৎকার দিন কাটছিল। এরই মধ্যে আমার বাবার শখ হলো একজন মেয়ের। আমরা শুধু দুই ভাই, কোনো বোন নেই। তাই তিনি ছেলেদের বিয়ে দিয়ে ঘরে মেয়ে আনার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লেন।

আমি যেহেতু পড়ালেখার ঠিক মাঝামাঝিতে সেহেতু আমার ছোট ভাই-ই একমাত্র অপশন ছিল বাবার ইচ্ছা পূরণের।

হুট করেই তিনি সব কিছু ঠিকঠাক করে ফেললেন। এবং মোটামুটি ধুমধাম করেই ছোট ভাইয়ের বিয়ে হয়ে গেল।

বাড়ির নতুন সদস্য হয়ে এলো শান্ত, লক্ষ্মী একটা মেয়ে, বাবা মায়ের কাঙ্ক্ষিত আদরের মেয়ে হয়ে। ঠিক তেমনটিই হলো যেমনটি আমরা চেয়েছিলাম।

এভাবেই তিন মাস ছুটি কাটিয়ে ফিরে এলাম গন্তব্যে। এসেই ঝাপিয়ে পড়তে হলো পড়ালেখায়। দেখতে দেখতে দুই সেমিস্টার কেটে গিয়ে সামার এলো।

এবারও ছুটিতে গেলাম দেশে। সবাইকে নিয়ে খুব ভালো সময় কাটছিল। আড়াই মাস কেটে গেল টেরই পেলাম না। চলে আসার সময় খুবই ঘনিয়ে এলো। ঠিক তখনই ঘটলো বিপত্তি।

আমার বাবার শখ হলো ছেলেকে বিয়ে দেয়ার। আমার চরম অপ্রস্তুতি এবং অনিচ্ছার কথা পরিষ্কার জানা সত্ত্বেও তিনি মেয়ে পক্ষকে ফাইনাল কথা দিয়ে এলেন।

অবশেষে আমার বন্ধুর (বন্ধু বললে খুবই কম বলা হবে, সে আমার পরিবারের একজন সদস্য) সঙ্গে পরামর্শ করে বাবার সম্মান রক্ষার্থে বিয়েতে মত দিলাম।

২০০৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি (হ্যা, ভালোবাসা দিবসেই!) আমার বিয়ে হলো আমার বাবার অতি পছন্দের রাজকন্যার সঙ্গে।

প্রথম রাতে ঘরে ঢুকেই রাজকন্যার যে আচরণ ও কথার ধরন দেখলাম তাতেই মনে হলো যে, জীবন এবং নরকের মধ্যে বুঝি আর কোনো পার্থক্য রইলো না। তারপরও অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে কেন যেন তার হাত দুটো দেখতে চাইলাম। আর তখনই বুঝলাম রাজকন্যার একটি হাত প্রায় অকেজো। দ্বিতীয় এবং চরম ধাক্কাটা তখন খেলাম। ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম বাবা, মা তাদের রাজকন্যা বধূকে নিয়েই থাক, আমি এই দফায় দেশ ছাড়লে আর দেশমুখো হবো না।

বিয়ের দুই দিন পর ফিরে এলাম অস্ট্রেলিয়াতে। যোগাযোগ প্রায় বন্ধ করে দিলাম বাসার সঙ্গে। মা আমার বুঝতে পেরে কান্নাকাটি করতে লাগলেন। আমার কেমন যেন সবার জন্য সব অনুভূতি মরে গেল। এদিকে পড়ালেখারও বারোটা বাজার যোগাড়। বহু কষ্টে পড়ালেখার কনসেনট্রেট করার চেষ্টা করলাম।

এভাবে দীর্ঘ আট নয় মাস *বিবাহিত* থাকার পর একদিন রাজকন্যার প্রেমপত্র অর্থাৎ ডিভোর্স লেটার পেলাম।

ভিন্ন একটা অনুভূতি হয়েছিল সেদিন। শুধু ভাবছিলাম বিয়ে কি জিনিস বোঝার আগেই ডিভোর্স লেটার পেলাম। কিন্তু আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছিলাম। কারণ এ চিঠিটার জন্যই আমি অপেক্ষা করছিলাম। আমার বাকি জীবনটা একটা দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে কাটাতে হবে না।

ডিভোর্স লেটারটার সঙ্গেই ছিল কয়েকদিন। কেন যেন বার বার পড়েছি।

অনেক দিন কেটে গেল তারপর। এখন মনে হয় এই বেশ ভালো আছি। নিজের জন্য নিজের বেচে থাকা। তারপরও বন্ধুবান্ধব যখনই বিয়ের কথা বলে তখনই সেই রাজকন্যার প্রথম রাতের কথা মনে হয়। আর তখনই ভাবি, আবার?

দেশ ছেড়েছি দুই বছর হলো। আগে খুব ইচ্ছা করতো দেশে যেতে। কিন্তু এখন চিন্তা করলেই কেমন যেন ভয় হয়। তাই অপেক্ষায় আছি ভয় কাটার। যদি কখনো আগের দিনগুলোর মতো মনে হয়, যখন দেশে যাওয়াটা একটা থৃল ছিল তখনই হয়তো যাবো। এতো দিনে সব কিছু ভুলে যাবার চেষ্টা করেছি বা ভুলে গেছিও। তবে

এখনো প্রচণ্ড কষ্টটা তখনই চাড়া দিয়ে ওঠে যখন মনে হয় যে, চরম চেষ্টা করেও আমার বাবাকে সেদিন বোঝাতে পারিনি, বিয়েটা কোনো ছেলেখেলা নয় এবং এর ফলাফল কখনো শুভ হবে না।

নাম ও পূর্ণ ঠিকানা বিহীন
অস্ট্রেলিয়া থেকে

পত্রমিতালী

– অশ্রু

পত্রমিতালী করা ছিল আমার একটি অন্যতম শখ। ১৯৯৯ সাল। আমি তখন ক্লাস টেনে পড়ি। আমি এবং আমাদের পাড়ার একটি মেয়ে এক সঙ্গে কোচিং করতাম। একদিন তার কাছে জানতে পারলাম, পত্রমিতালী করার জন্য একটি বই বের হয়েছে। বইটিতে বিভিন্ন ছেলেমেয়ের ছবিসহ ঠিকানা দেয়া আছে।

হঠাৎ করেই মাথায় বুদ্ধি এলো, আমিও পত্রমিতালী করবো। যেহেতু আমি হিন্দু, তাই আমরা দুজন মিলে হিন্দু ছেলে খুজতে লাগলাম। অবশেষে একটি ছেলেকে ছবি দেখে ভালো লাগলো।

তার ঠিকানায় বন্ধুত্ব করার জন্য চিঠি ছাড়লাম।

কিছু দিন পর তার কাছ থেকে উত্তর পেলাম। তার প্রথম চিঠি পেয়ে কি যে খুশি হয়েছিলাম তা আমার কাছে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এরপর থেকে আমরা একে অপরকে চিঠি দিতে থাকি।

তার লেখা এবং লেখার ভাষা ছিল খুব সুন্দর। যেদিন তার চিঠি পেতাম সেদিন আমার খুশির সীমা থাকতো না। সেদিন আমার চেহারা দেখলেই দিদিরা বুঝতে পারতো যে, আমার চিঠি এসেছে। সেদিন রাতে আমি পড়তে বসতাম না। কমপক্ষে পাচ ছয় বার তার চিঠি পড়তাম। চিঠির উত্তর লিখতে লিখতে রাত পার হয়ে যেতো। তাকে আমার খুব ভালো লাগতো।

যতো দিন যায় তার প্রতি ভালোবাসা ততো বাড়তে থাকে। কিন্তু তাকে এ কথা জানানোর সাহস পাচ্ছিলাম না। তার লেখার মধ্যে এমন কিছু কথা থাকতো যাতে মনে হতো সেও আমাকে পছন্দ করে। তখন আনন্দে মনটা ভরে যেতো।

একবার সে লিখেছিল তুমি তো এখন আমারই।

অপর একটি চিঠিতে লিখেছিল ভালোবাসা মানে তুমি আর আমি।

তার এ ধরনের লেখায় তার প্রতি আকর্ষণ বাড়তে থাকে। সে আমার নাম দিয়েছিল অশ্রু। ভালোবাসতাম তাকে। তাই চিঠির শেষে প্রায়ই লিখতাম, *তোমার অশ্রু।*

একদিন সে জানতে চাইলো, আমি কেন এভাবে লিখি। আমি তার হতে চাই কি না।

লজ্জা পেয়ে এ প্রশ্নের কোনো উত্তর তাকে দিইনি। অথচ মাঝে মধ্যে সেও লিখতো, *তোমার* ....।

সে খুব ভালোভাবেই জানতো আমি তাকে খুব ভালোবাসি। আমার দুর্বলতা সে অনেক আগেই টের পেয়েছিল।

একদিন সে চিঠিতে লিখলো, তার সঙ্গে প্রেম করতে চাই কি না।

তার এ রকম প্রশ্নে আমার হ্যা সূচক মত দিতে একটুও দেরি করিনি।

চিঠির মাধ্যমে আমরা একে অপরের ভালোবাসা প্রকাশ করতাম। তার বাড়ি ছিল যশোর। তাই সামনাসামনি দেখা হবার সৌভাগ্য হয়নি। আজও মনে পড়ে, এমন একটি দিনও যায়নি যে, তাকে নিয়ে ভাবিনি। আমার এসএসসি পরীক্ষা ছিল ২০০০ সালে। কিন্তু আমি পড়াশোনায় মনোযোগ না দিয়ে তার ভালোবাসায় মগ্ন ছিলাম বেশি।

তবে সে আমাকে পড়াশোনার প্রতি খুব উৎসাহ দিতো।

আমার এসএসসি পরীক্ষা শেষ হলো। কোনোমতে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করলাম। বয়সে ছোট ছিলাম। তাই ভালোবাসার গভীরতা ছিল অনেক বেশি। তার ছোটখাটো কথায় কষ্ট পেতাম খুব।

কিছু দিন পর তার লেখায় পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। তার চিঠিতে অন্য একটা মেয়ের আভাস পেলাম।

তার এমন ব্যবহার কষ্ট পেলাম খুব বেশি। রাগ করে তাকে একটি চিঠি দিলাম এবং জানালাম, তাকে আর কোনোদিন লিখবো না। সেই চিঠিতে রাগের মাথায় অনেক কিছুই লিখলাম। সেই চিঠি দেয়ার পর তার কাছ থেকে কোনো উত্তর পেলাম না। হয়তো সে আমার ওপর রেগে ছিল। তার কোনো উত্তর না পেয়ে ভীষণভাবে ভেঙে পড়লাম। আর থাকতে না পেরে নিজেই চিঠি লিখলাম তার কাছে। পরপর তিন চারটি চিঠি দেয়ার পর দীর্ঘ ছয় মাস পরে তার চিঠি পেলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম, সব কিছু ভুলে গিয়ে তাকে শুধু বন্ধু ভাববো। কিন্তু জানি না আজও তা পেরেছি কি না।

এরপর থেকে দুজন দুজনকে বন্ধু হিসেবে চিঠি লেখা শুরু করি। অনেক দিনের জমানো ভালোবাসায় ছেদ পড়লেও ভালোবাসা তার জন্য বিন্দুমাত্র কমেনি। তারপর থেকে আমরা আজ পর্যন্ত বন্ধুই আছি। সে এখন আর নিয়মিত লেখে না। এক মাস কিংবা দুই মাস অন্তর একটি চিঠি পাই।

আমি এখন অনার্স সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী। আজও তার চিঠি এলে ভালো লাগায় মনটা ভরে যায়। হয়তো আজও মনের ভেতর কোনো এক জায়গায় ভালোবাসা জমে আছে তার জন্য।

এইচএসসি পর্যন্ত একমাত্র ছেলে বন্ধু ছিল সে। অনার্স ভর্তি হয়ে বেশ কয়েকজন ভালো বন্ধু হয়েছে। তারা আমার প্রকৃত বন্ধু। একজন বন্ধু যতোটুকু ভালো হওয়া উচিত তারা ঠিক ততোটুকুই ভালো।

এরপর আমার জীবনে ভালোবাসা আর আসেনি। কাউকে ভালোবাসার সাহস পাইনি। ভালোবাসায় ভীতি রয়েছে খুব বেশি। তবে সে যেন তার ভালোবাসা পায় এতোটুকুই চাই। পৃথিবীর সবটুকু সুখ সে পাক এটা আমার একমাত্র কামনা। তার প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই। তবে তার বন্ধুত্ব থেকে বঞ্চিত হতে চাই না। কারণ তাকে আজও ভালোবাসি।

দিনাজপুর থেকে

জিসেম

– শাহীন

ভালোবাসা দিবস। সমগ্র বিশ্ব যেদিন ভালোবাসায় মেতে ওঠে সেদিন সবারই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ঝুলিতে কিছু না কিছু সঞ্চয় হয়। তেমনি আমার ঝুলিতেও কিছু একটা সঞ্চয় হয়েছিল যা আমাকে একদিকে প্রচন্ডভাবে আন্দোলিত করে, অন্যদিকে শিহরণ জাগায়।

ঘটনাটা খুলেই বলি। একজন রমণী যাকে ভালোবেসেছিলাম সম্রাট শাহ্জাহানের মতো আবেগ নিয়ে। তাকে নিয়েই আমার আজকের লেখা।

শুরু করার আগে তার একটা নাম দেয়া প্রয়োজন। তার নাম জিসেম (ছন্দনাম)। সময়টা ছিল ২০০২ সাল ১২ ফেব্রুয়ারি। জিসেম-এর সঙ্গে প্রেমের আলাপ চলছিল।

কথার মাঝে জিসেম বললো, ১৪ তারিখ তুমি লঞ্চ টার্মিনালে এসো।

বললাম, কেন?

সারা দিন লঞ্চ দিয়ে ঘুরবো আর নদী দেখবো।

সায় দিয়ে বললাম, কখন?

সকাল এগারোটায়।

বিদায় নিয়ে চলে এলাম হস্টেলে। উল্লেখ্য যে, আমি মফস্বল শহরের একটি কলেজে অনার্সে পড়ি। জিসেম–কে নিয়ে আমার বন্ধু মহল প্রায় হাসি–ঠাট্টা করতো। মাঝে মধ্যে কুৎসিত শব্দও ব্যবহার করতো। আমি তেমন গা করতাম না।

অনেক অপেক্ষার পর কাঙ্ক্ষিত সেই দিনটি এলো। সকালে ঘুম থেকে উঠে গোসল করে তৈরি হয়ে নিলাম। এমন সময় মোবাইলের রিং বেজে ওঠলো। রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে একটি মেয়েলি কণ্ঠস্বর আমাকে জানালো, আজ সকাল নয়টায় জিসেম এক ছেলেকে সময় দিয়েছে। আর শুনলাম ছেলেটির সঙ্গে জিসেমের নাকি ফাটাফাটি প্রেম।

শোনার পর মনে হলো আমার ওপর সমস্ত আকাশটি ভেঙে পড়ছে আর আমি কোনো গভীর অতলে তলিয়ে যাচ্ছি। মুখ দিয়ে একটি শব্দও করতে পারলাম না। মোবাইলটি পাশে রেখে শরীরটা ছেড়ে দিলাম বেডের ওপর। নিজেকে ফিরে পেয়ে অনেক্ষণ ভাবলাম। নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম। হয়তো শত্রুতা করে মেয়েটি আমাকে ব্ল্যাকমেইল করতে চাইছে। তার চেয়ে বরং ঘটনার সত্যতা যাচাই করে দেখি।

হিমন আমার রুমমেট আমার মুখ দেখে জিজ্ঞাসা করলো, কি রে, এনিথিং রং।

বললাম, না, কিছু না। এর আগের দিনে হলমার্কস থেকে কেনা কার্ড ও উপহারগুলো সঙ্গে নিয়ে বের হয়ে গেলাম।

তখন সকাল আটটা পাচ। আবার সেই নামহীন মেয়ের ফোন এলো। এবং একই কথা শোনালো।

বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কে আপনি?

আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী।

ধমক দিয়ে বললাম, আমি বিশ্বাস করি না।

প্রমাণ চান।

হ্যা, প্রমাণ চাই।

তাহলে চলে আসুন।

কোথায়

ঠিকানা দিয়ে বললো, ঠিক সাড়ে নয়টায় আসবেন।

OK.

তখন বাজে প্রায় সোয়া আটটা।

নাশতা খাওয়ার ইচ্ছা উবে গেল। পর পর পাচটা সিগারেট আর এক কাপ চা খেয়ে ঘোরাঘুরি করে রওনা দিলাম নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। সময় মতো গিয়ে হাজির হলাম। জায়গাটি পরিচিত হলেও কখনো আসিনি। জায়গাটা একটু নির্জন। সামনে পঞ্চাশ গজ দূরে একটি বাড়ি। এক তলা বিল্ডিং। একই বাড়িই আমার গন্তব্য। ভাবছি কিভাবে বাড়িতে ঢুকবো।

এমন সময় ফোনটি এলো। আমাকে বললো, আমার নির্দেশ মতো কাজ করুন।

বললাম, কি করবো?

বাড়িটির পেছনে চলে আসুন।

তারপর।

পেছনের দ্বিতীয় জানালার সামনে দাড়ান।

তারপর।

জানালা দিয়ে ভেতরে তাকান।

OK.

নির্দেশ মতো গেলাম। সৌভাগ্য, জানালার একটি কাচ অর্ধেক ভাঙা আর পেছনের এদিকটায় যাতায়াত নেই বললেই চলে। দেরি না করে ভেতরে তাকালাম। নিজের অজান্তেই কেপে উঠলাম। যা দেখলাম তা প্রকাশ করার মতো ভাষা আমার লেখনিতে নেই। তবুও বলছি, খাটের ওপড় দুটি নগ্ন দেহ আদিম খেলায় লিপ্ত।

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম। আস্তে করে সরে এলাম। হঠাৎ মাথায় দুষ্ট একটা বুদ্ধি এলো। চিন্তা করে দেখলাম, আমাকে যে মেয়েটি ফোন করেছিল সে এ বাড়ির কেউ। নাহলে এত সুন্দর করে কেউ ডিরেকশন দিয়ে আমাকে এখানে আনতে পারতো না।

মোবাইল থেকে তাকে ফোন দিলাম। আমার ধারণাই সত্যি হলো। সে এ বাড়ির মেয়ে। ধন্যবাদ জানিয়ে তাকে আমার মনের কথা খুলে বললাম।

আমাকে অবাক করে দিয়ে সে রাজি হলো।

ইতিমধ্যে মাটি কাটার সেই শ্রমিকটি হাসিমুখে বের হয়ে আমার পাশ দিয়ে চলে গেল।

আমি বাড়িতে ঢুকলাম।

মেয়েটি দরজায় দাড়িয়ে।

আবারও আমাকে আবাক হতে হলো। সে দাড়িয়ে আছে। সে এমন একজন যে আমাকে একতরফা দুই বছর যাবৎ ভালোবাসছে। আমি পাত্তা দিইনি। লজ্জায় আমার মাথাটি নত হলো আরেকবার।

তাকে কি নাম দেবো? হ্যা, তার নাম দিলাম মন। আমার অন্তর ভরে উঠলো ভালোবাসায় মনের জন্য। কথা বললাম কিছুক্ষণ। কার্ড ও উপহার দিয়ে উইশ করলাম তাকে। ততোক্ষণে বুঝে ফেলেছি বাড়িতে ওর মা বাবা কেউ নেই।

জিজ্ঞাসা করলাম, ও (জিসেম) কোথায়?

বললো, ওই রুমে।

দেরি না করে রুমে ঢুকলাম।

আমাকে দেখে জিসেমের চোখ তো ছানাবড়া হয়ে গেল।

জিজ্ঞাসা করলো, তুমি এখানে?

বললাম, কেন, তোমার কোনো অসুবিধা হলো নাকি?

আমতা আমতা করে বললো, না, অসুবিধার কথা বলছি না। আসলে তোমার তো এখানে থাকার কথা না।

ঠিক তাই। হঠাৎ জানতে পারলাম এখানে একজন বেশ্যা আছে। তাই খদ্দের হয়ে এলাম। চলো শুরু করি।

মানে! কি বলতে চাও তুমি?

কিছু বলতে চাই না। কিছু করতে চাই। প্রয়োজনে টাকা অ্যাডভান্স দেবো, নাও। বলে দুইশ টাকা হাতে গুজে দিলাম।

ততোক্ষণে সে যা বোঝার বুঝে নিয়েছে। আর কোনো কথা না বলে জিসেম আমার পা জড়িয়ে বললো, আমাকে ক্ষমা করে দাও প্লিজ।

বললাম, যাও ক্ষমা করে দিলাম। তবে আমার সামনে তুমি আর এসো না।

যেতে না চাইলেও সে যেতে বাধ্য হলো।

একটু পর এলো মন। নিজেকে সামলাতে না পেরে মনকে জড়িয়ে ধরলাম। চুমোয় চুমোয় রাঙিয়ে দিলাম মনকে।

লজ্জায় আমার বুকে মাথা লুকালো মন।

আজও আমি মনকে ভালোবাসি। আর মন ভালোবাসে শুধুই আমাকে। মন আমার ভালোবাসা। আমার সব কিছু।

মুন্সিগঞ্জ থেকে

একলা

- লিজি পাশা

নেমে আসছি সেগুনবাগিচার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তিন তলা থেকে। আমার পাশে খুব কাছে প্রায় গা ঘেষে হাটছে পি।

আমরা দুজনে সমানতালে পা ফেলে সিড়ি ভাঙছি। এতো কাছে ও। ওর গায়ের চিরচেনা গন্ধ আমার নাকে এসে লাগছে। ওর শরীরের উষ্ণতা অনুভব করতে পারছি। শুধু একটু হাত বাড়ালেই ছুতে পারি ওকে।

এক অদ্ভুত ভালো লাগার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে নিচে নেমে এলাম। কে যেন পাশ থেকে বললো, আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম।

বহুদূর থেকে ভেসে এলো যে স্বরটি তা শোনা না শোনার মতো।

ওই তো কার পার্কিংয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমাদের লাল টয়োটা পার্ক করা। আমাদের জীবনে যতো গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট্ট গাড়ি। সাত বছরের ইমরান যাকে ওর বন্ধুরা আদর করে *ইমি* বলে ডাকে ওর পছন্দ করা রঙের ওর প্রিয় গাড়ি। কোথাও গেলে আমার সময় যে কথা সব সময় পি বলে, আজও বললো।

তুমি দাড়াও, আমি গাড়ি নিয়ে আসি।

আমি দাড়ালাম। এবং দাড়িয়েই থাকলাম।

পি আমাকে অন্তহীন অপেক্ষায় রেখে চলে গেল। কিন্তু গাড়ি নিয়ে ফিরে এলো না।

ভালো করে চেয়ে দেখলাম সামনেই গাড়ি পার্কিং প্লেস। কিন্তু কোথাও নেই আমাদের লাল টয়োটা। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে বাস্তবে ফিরে এলাম। এতো ১৯৮৭ সাল নয়, আজ ১৪ ডিসেম্বর ২০০৪।

আমাকে একা হেটে গেটের বাইরে যেতে হবে। রাস্তা পার হয়ে ট্যাক্সি অথবা বাস খুজে নিতে হবে। তবে এতোক্ষণ কোথায় ছিলাম সময় হারা হয়ে?

প্রায় বিশ বছর আগে চলে গেলাম! কিছুক্ষণ আগেও ইচ্ছে করলে ওর হাত ধরতে পারতাম। সে হাত চিরদিনের জন্য আমার হাতের বাইরে চলে গেছে। মানুষ কি বিশেষ কোনো মুহূর্তে ফিরে যেতে পারে ফেলে আসা অতীতে! এর ব্যাখ্যা আমার জানা নেই।

কিভাবে চাপা পড়তে পড়তে রাস্তা পার হয়ে বাসে উঠে বসলাম! সব কুয়াশার মতো। বাসে বসে আমার চোখ গলে পড়তে লাগলো। চশমা চোখে পাথর হয়ে বসে রইলাম।

ঢাকা শহরের অগুণতি মানুষ এক স্বরে বলছে যেন। একলা তুমি একলা তুমি।

একা আমি! এর চেয়ে সত্যি এখন আর কিছু নেই আমার জীবনে।

সকালে যখন খবরের কাগজ হাতে পড়তে বসি বারান্দায়, চড়ুই পাখি কিচিরমিচির করে বলে, একলা তুমি। সে ভাষা কেউ বোঝে না, আমি বুঝি। যখন সন্ধ্যাবেলা জানালা বন্ধ করি, দমকা বাতাস এসে বলে, একলা তুমি। এখন পি–র সঙ্গে কথা বলি। ওর বুকে মাথা রেখে ওর পছন্দের পুরনো হিন্দি গান শুনি।অলৌকিকভাবে বাতাসে ভেসে আসে ওর প্রিয় কবিতা, *যেতে নাহি দেব*।

তোমার মনে আছে? যখন আমরা আমেরিকা যাওয়ার কথা বলতাম, তুমি বলতে, তোমার যেখানে খুশি যাও, আফ্রিকা ছেড়ে কোথাও যাবো না আমি বাংলাদেশ ছাড়া।

তুমি প্রতিটি সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা গুণতে বাংলাদেশে ফিরে আসার জন্য। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে তোমার সবচেয়ে প্রিয় সে দেশের মাটিতে রচিত হয়নি তোমার শেষ শয্যা। যাকারাভার বেগুনি ফুলে ফুলে ছাওয়া পরবাসে কাটাচ্ছ তোমার অনন্তকাল।

দেশে ফিরে আসার আগে ভেবেছিলাম শেষ উপহার দেবো তোমাকে। একটা শিউলি গাছ কোথাও দেখলাম না। বেলি ফুল, তাও পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত দিলাম হাসনাহেনা।

নিজ হাতে রোপণ করলাম। বেশি পানি দিলাম না যদি ভিজে যাও। সব সময় শীতে কাতর থাকতে তুমি। জানি না এখন তুমি হাসনাহেনার গন্ধে সুরভিত হও কি না। জানার উপায়ও নেই। ইচ্ছে হলেও যাওয়া যায় না তোমার কাছে। কেবল প্রচণ্ড কষ্টের মুহূর্তে অনুভব করি তোমার উপস্থিতি। কখনো নিয়ে যাও আমাদের ফেলে আসা দিনগুলোতে যা ছড়িয়ে আছে পৃথিবীময়।

মাঝখানের অনেকগুলো বছর অপ্রত্যাশিতভাবে অন্য রকম কেটেছে। অনেকগুলো বছর বলা হয়নি তোমার যে কথা, আজ মন প্রাণ উজাড় করে বলছি *আই লাভ ইউ। আই লাভ ইউ ভেরি ভেরি মাচ।*

ঢাকা থেকে

অঞ্জলি

জীবন,

কোনো পুরুষকে উদ্দেশ্য করে লেখা এ আমার দ্বিতীয় চিঠি। প্রথমটি তো তোমাকে সরাসরিই পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু দ্বিতীয়টি পাঠানোর মতো সাহস অর্জন করতে পারলাম না বলে আমার যায়যায়দিন–এর শরণাপন্ন হলাম, অপরাধ ক্ষমা করো।

মনের মধ্যে অহর্নিশ যে কথাগুলো গুঞ্জন করে ফেরে, কলমের ডগায় তা সবটা হয়তো কোনোকালেই উঠে আসবে না। তবুও কিছু লেখার চেষ্টা করছি।

জীবন, তোমাকে আগেও বলেছি, আজও বলছি, এ জীবনে আমি কখনো সংসারের কাছে, সমাজের কাছে, ব্যক্তিগত জীবনে এমন কোনো অপরাধ করিনি যা ক্ষমা করা যায় না। যে ভুল ক্ষমা করা যে, অথচ তার জন্য আমায় অনন্তকালের নির্বাসন দণ্ড দিলে! আর আমিও অকুণ্ঠ চিত্তে সে শাস্তি মাথা পেতে মেনে নিলাম!

অবশ্য মেনে না নিয়ে কিই–বা করতে পারতাম আমি, তুমি যে দয়া করে এখনো আমার মোবাইল রিসিভ করো এটাই তো আমার পরম সৌভাগ্য বলে মনে করি। কারণ এটুকুও না পেলে পৃথিবীতে আমার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই তো দায় হতো।

জীবন, তোমাকে কেমন করে বোঝাবো, আমার সমগ্র আত্মা, সমগ্র অস্তিত্বে কি নিবিড়ভাবেই না জড়িয় আছো তুমি! গত দেড় বছর ধরে আমার একটা দিনও মনে পড়ে না যেদিন তোমার কথা না ভেবে ঘুম ভেঙেছে এবং রাতে চোখের পাতা বন্ধ হবার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত সমস্ত সময়টুকু জুড়ে শুধু তুমি।

এ কথা বললে হয়তো পাপ হবে তবুও বলছি, তোমার ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আমার অহর্নিশ যে সাধনা সে সাধনায় হয়তো আল্লাহকেই পাওয়া যেতো। পবিত্র শব্দের মতো আমি তোমার নামটি জপতে থাকি। মাঝে মধ্যে ভাবি, আমি কি পাগল, নাকি এ সমস্ত আমার অভিনয়! কিন্তু যখন দেখি তোমার কথা তিন চার দিন না শুনতে পেলে আমি জ্বরে পড়ে যাই, বিছানা থেকে মাথা তুলে দাড়াতে পারি না তখন এটাকে কিভাবে নেবো, তুমি বলো।

তুমি মাঝে মধ্যে আমাকে বোঝাও, পৃথিবী পরিবর্তনশীল। তুমিও পরিবর্তিত হও।

কিন্তু আমি তো নিজেকে সেই সব হতভাগ্যদের দলে নিজেকে ফেলতে পারি না যারা এই ভালোবাসে আবার এই ভুলে যায়। এবং এ করতে করতেই জীবনটা কেটে যায়। ভালোবাসা যে একটা আলো, যা নিকষ কালো অন্ধকারকেও আলোকিত করতে পারে। ভালোবাসা যে একটা অমূল্য সম্পদ যা বিত্তহীনকেও অসীম বিত্তবান করতে পারে, এ সুন্দর সত্যকে তারা কোনোকালে জানতে পারে না।

জীবন, আজ তোমার কাছে একটু ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই চাই না। যদি প্রতিদিন এক মিনিটের জন্য তোমার কথা শুনতে পাই, আমার অন্তত ৩৬৫ দিনে একবার দেখতে পাই তবেও আমার এ প্রতিহত, নিষ্ফল,

যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনে অনেকটা শান্তির বাতাস বইবে এবং আমাকে পৃথিবীতে বাচিয়ে রাখতে পারবে অনেক দিন। এ কি খুব বেশি চাওয়া, জীবন?

জীবন, তুমি রাগ করো না বা এর জন্য নতুন কোনো শাস্তির ব্যবস্থা করো না। একটা কথা তোমাকে না বলে স্বস্তি পাচ্ছি না। আজ আমার এমন অবস্থা হয়েছে যে, তুমি ছাড়া এই পৃথিবীতে অন্য কেউ আমাকে স্পর্শ করেছে এ কথা ভাবলেও আমার সমস্ত শরীর, আত্মা ঘৃণায় কুকড়ে যায়। মনে হয় মহা পাপ করে ফেলেছি আমি। তুমি কি ভাবতে পারো, কেমন হবে ভবিষ্যৎ, জীবন? অন্তরে, বাইরে আমার দ্বারা কোনোকালেই হয়তো সম্ভব হবে না অন্য কাউকে স্থান দেয়া। তবুও চাই না তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে আমার কাছে ফিরে আসো তুমি। বুকে না হয় না থাকলে, মাথায় থাকো। আমি আমৃত্যু তোমার চরণ কল্পনা করে আশার ভালোবাসার অঞ্জলি অর্পণ করে যাবো।

ইতি

আমি

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক, খুলনা থেকে

ভালোবাসার রকম- সকম

– ঝর্না

মানুষের জীবনে বিভিন্ন সময়ে ভালোবাসা আসে বিভিন্ন রূপ নিয়ে। ঘটিত সময়ে বয়সের ওপর নির্ভর করে ভালোবাসার রূপ, রস ও প্রকার ভেদ হয়ে থাকে। আমার জীবনেও ভালোবাসা এসেছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে।

খুব ছোটবেলায় দাদা–দাদির আদর পেয়ে ভালোবাসার প্রথম ধাপ অতিক্রম করেছি। বিশেষ করে দাদার কথাই বলবো। সেই ছোট বয়সে অন্তরের সবটুকু ভালোবাসা ছিল দাদার জন্য। খুব ভোরবেলা কিংবা বিকেলবেলা বকুল ফুল কুড়িয়ে মসজিদের সিড়িতে বসে মালা গেথে সবার আগে দাদার গলায় পরিয়ে দিতাম। গন্ধরাজ ফুল গাছটির সবচেয়ে বড় ফুটন্ত ফুলটি দাদাকে না দেয়া পর্যন্ত শান্তি পেতাম না। দাদা কি যে খুশি হতেন সামান্য কিছুতেই দোয়া করতে ভুলতেন না। ফুল এবং ফুলের মালা যত্ন করে বালিশের নিচে রেখে দিতেন।

দাদাকে গোসল করানো, অজু করার জন্য কল চেপে দেয়া, হাত ধরে মসজিদে নামাজ পড়তে নিয়ে যাওয়া, এসব ছিল আমার নিত্য কাজ। দাদার সঙ্গে এক থালায় ভাত খেতাম। ঘুমিয়ে থাকলে হাতে পাখা দিয়ে বাতাস করতাম। দাদা কিভাবে যেন টের পেয়ে যেতেন। বলতেন, এবার নিজের গায়ে বাতাস কর। মিথ্যে করে বলতেন, আমার শীত লাগছে ইত্যাদি আরও কতো কথা।

দাদার দাত ছিল না। দাদির চোখকে আড়াল করে কিছুটা পান বেশি নিয়ে ছেচে দাদার হাতে দিতাম। দাদা নিজে কিছুটা রেখে বাকিটা আমাকে দিয়ে দিতেন।

এরপর এসএসসি দিয়ে ঢাকায় চলে আসতে বাধ্য হই। মাঝে মাঝে বাড়িতে যেতাম। দাদার জন্য খুব টান অনুভব করতাম। ওই বয়সে আমার সমস্ত ভালোবাসা ছিল দাদার জন্য।

বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে চলে গেলাম দূরে। তখন ভালোবাসা চলে এলো মা–বাবার জন্য। দূরে থাকতাম বলে প্রতিক্ষণে মায়ের মুখটি চোখের সামনে ভেসে উঠতো। মাঝে মধ্যে বেড়াতে গেলে আমার পছন্দের সমস্ত খাবার রাধতেন। এতো পদ রান্না করে কি যে তৃপ্তি পেতেন! সন্তানের জন্য মায়ের যেন কোনো কষ্ট নেই।

সংসার করা সুস্থ মানুষটা হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে গেলেন। নিমেষেই বিছানা নিলেন।

প্রায়ই দেখতে যেতাম।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে বলতেন, *মা, তোমরা জামাই নিয়ে বেড়াতে আসো, আমি তোমাদের রান্না করে খাওয়াতে পারি না, তোমাদের কোনো যত্ন করতে পারি না, তোমরা মনে কোনো কষ্ট নিও না।*

অসুস্থ মায়ের এসব কথা শুনে মনটা আর্দ্র হয়ে উঠতো। চোখের পানি ধরে রাখতে পারতাম না। সন্তানের জন্য অপার স্নেহ, অপরিসীম ভালোবাসা, এই হচ্ছে মায়ের আসল রূপ।

কিছু দিন পর মা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। ভালোবাসার একটা দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

বছর না ঘুরতেই বাবাও বিছানা নিলেন। সঙ্গী ছাড়া তিনিও বেশি দিন আমাদের কাছে থাকতে চাইলেন না। মারা যাবার আগে মাস খানেক হাসপাতালে সংসার পাতলেন। প্রতিদিন একবার করে দেখতে যেতাম। যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন আমাকে কিছু খেতে দেয়ার জন্য। কিছুক্ষণ পর বলতেন, মা, বেলা থাকতে থাকতে চলে যাও, বাসায় আমার নানাভাইরা একা আছে। প্রতিদিন এতো টাকা পয়সা খরচ করে আসার দরকার নেই। ফোন করে খোজখবর নিও, তাতেই হবে।

মৃত্যু পথযাত্রী একজন বাবা, সন্তানের জন্য তার এই যে দুশ্চিন্তা তা বোধহয় পৃথিবীর কেউ করে না শুধু মা-বাবা ছাড়া। আজ তারা নেই। কিন্তু প্রতিক্ষণে তাদের ভালোবাসা অনুভব করি।

বিয়ের পর ভালোবাসা এসেছে শুধুই স্বামীর জন্য। এ অন্য রকম ভালোবাসা। এখানে আছে আবেগ, কামনা, লেন-দেন, আরো অনেক কিছু। আমি আমার স্বামীকে খুব ভালোবাসি। ভাব দেখে মনে হয়, স্বামী ভদ্রলোকও হয়তো আমাকে একটু বেশি পরিমাণেই ভালোবাসেন। তবে এই ভালোবাসাবাসির ব্যাপারটাকে আমি ভালোবাসার সংজ্ঞায় ফেলতে নারাজ। আমার মনে হয় ভালোবাসার আড়ালে এটা এক ধরনের নির্ভরতা। এই দাম্পত্য ভালোবাসাকে আমার কাছে এক এক সময় এক এক রকম মনে হয়। বিয়ের দশ বছর পর মনে হয় স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে স্বার্থ সম্বন্ধীয় ভালোবাসা।

সন্তানদের জন্য অন্য রকম ভালোবাসা অনুভব করি যার সঙ্গে পৃথিবীর কোনো ভালোবাসা তুলনীয় নয়। তাদের সমবয়সী যে ছেলেটি ময়লা নিতে আসে তার জন্য মন কেমন করে ওঠে। অন্তর থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। তার খালি গা দেখে নিজের বাচ্চার জন্য তুলে রাখা কোনো কাপড় হাতে তুলে দিই। খুশিতে তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কি যে ভালো লাগে দেখতে! যে ছেলেটি রোজ দুধ দিতে আসে তার জন্যও ভালোবাসা অনুভব করি। ইচ্ছে হয় ঈদের সময় তাকে একসেট নতুন কাপড় দিই। নানান সীমাবদ্ধতার কারণে কিছুই করতে পারি না। নিজের কাছে হারতে আমি রাজি নই। ঈদের দিন সামান্য কিছু টাকা হাতে দিতেই তার মুখে খুশির যে ঝিলিক দেখেছি, লক্ষ কোটি টাকা খরচ করেও তা পাওয়া যাবে না।

অনেক সময় পরিবারের কোনো আপনজনকে ভালোবেসে কিছু দিতে গিয়ে কিংবা কিছু বলতে গিয়ে অপমানিত হয়েছি, দুঃখ পেয়েছি বহুবার। চারদিকের স্বার্থপরতা আর হিংসার মাঝে ময়লা নিতে আসা ছেলেটি কিংবা দুধ দিতে আসা ছেলেটির উদ্ভাসিত মুখ মনে করে কিছুটা হলেও শান্তি পাই।

জয় হোক ভালোবাসার।

গোড়ান, ঢাকা থেকে

স্বেচ্ছাচারিতা

– সুদীপ্ত শাহীন

২০০১ সাল। আমি একজন সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী বেকার। গত তিন বছরে অসংখ্য চাকরির ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি নামের সোনার হরিণের সাক্ষাৎ পাইনি। পরিবারের সবার কাছে এক সময়ে হয়ে গেছি বোঝা স্বরূপ। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম, আমার শুভাকাঙ্ক্ষী সকলেই আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছেন। যন্ত্রণাপূর্ণ দীর্ঘ কতো রাত যে নির্ঘুমে কাটিয়েছি তা কেবল আল্লাহপাকই জানে।

দুই দুবার বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে নিজের সম্পর্কে এতোটা হতাশ হয়ে পড়ি যে, আমার পক্ষে আর ভালো চাকরি যোগাড় করার মতো মনোবল অবশিষ্ট ছিল না। দুরবস্থার সময়ে স্থানীয় একটি মহিলা কলেজে চাকরির সুযোগ আসে। তবে সেখানে মোটা অংকের ডোনেশন দিয়ে চাকরি নিতে হবে। চাকরির বাজার ক্রমেই সীমিত হয়ে আসছে। এভাবে আর বসে থাকার সময় নেই ইত্যকার নানান কথা শুনে আমার দুই কান ঝালাপালা হবার জোগাড়।

কলেজে বিপুল পরিমাণ টাকা দেয়া ঠিক এই মুহূর্তে আমার পক্ষে কষ্টকর হলেও অথৈ সাগরে ঝাপ দেয়ার মতোই কিছু টাকা কলেজে দিই। তিন চার মাস পরে আমার টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার কাছে টাকা না থাকায় নানান ধরনের দুশ্চিন্তায় অস্থির। এ অবস্থায় আমাকে নানান দিকে ছুটতে হচ্ছে। কোথায় টাকা পাওয়া যায়, কিভাবে এতো টাকা সংগ্রহ হবে সেই চিন্তায় মাথা ঠিক নেই।

দুপুরে বাড়ি ফিরে শুনলাম আমাদের বাড়িতে একজন এইচএসসি পরীক্ষার্থিনী আসন্ন পরীক্ষার জন্য থাকবে। এবং আজ তারা দেখা করতে এসেছে। আমার বড় ভাবীর বোনের ননদ। বাড়ি থেকে বের হবো, দরজার সামনে সে দাড়িয়ে। চোখে চোখে দেখা হলো। মুহূর্তে আমরা স্থির হয়ে গেলাম। কেউ কোনো কথা বলছি না। ভাবীর বোনের ধাক্কায় সংবিৎ ফিরে পেলাম।

দেখতে আহামরি কিছু না। সেদিন কোনো কথা হলো না।

পরীক্ষা শুরু হবার কয়েকদিন আগে সে এলো। প্রথমে কোনো আগ্রহ দেখাইনি। প্রশ্ন কমন পড়ছে কি না, পরীক্ষা কেমন হলো এই জাতীয় কথা দিয়ে শুরু হলো তার সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ। কাকতালীয়ভাবে পরীক্ষার আগের রাতে যেসব প্রশ্ন কমন মার্ক করি সেগুলোই পরদিন পরীক্ষায় প্রায় এসে যায়।

তার পড়ার টেবিলে বসে পড়ার ফাকে ফাকে নানান কথা হয়। সেদিন তার পরীক্ষা ছিল না। কলতলার পাশে একটি মোড়া পেতে আমি পল্লিগীতির সুর দিচ্ছি। এমন সময় সে এলো গোসল করার জন্য।

আমাকে দেখে ভাবীর কাছে অনুযোগ করে বললো, আপা, আপনার দেবরকে এখান থেকে চলে যেতে বলুন। যেমন গান গাইছে তাতে হেমায়েতপুর নিতে হবে।

কথাটা শুনে মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। এ মেয়ে বলে কি! আমি তার কথার প্রেক্ষিতে বললাম, আমি কারো জন্য পাগল হই না। তবে কাউকে কাউকে পাগল বানিয়ে ছাড়ি।

আমার কথা শুনে সে বললো, পাগল বানানো এতো সহজ না।

আমি সরে এলাম। তাকে বিরক্ত করার কোনো ইচ্ছাই আমার ছিল না। রাতে মোটেও ঘুম এলো না। সে রাতে প্রশ্ন কমন মার্ক করতেও তার পড়ার ঘরে গেলাম না। মনে হলো তাকে একটু পাগল বানিয়েই ছাড়ি।

পরদিন সকালে দেখা হলে জানতে চায় গতরাতে কোথায় ছিলাম।

বললাম, জাহান্নামে ছিলাম। যেখানেই থাকি তাতে আপনার কি?

আমার কথায় সে মন খারাপ করলো। প্রথম দিন কথা বলার সময়ই তাকে আপনি বলে সম্বোধন করেছিলাম। এতে সে আপত্তি করলো। আমাকে তুমি সম্বোধন করতে হবে। আপনি আমার চেয়ে বয়সে কতো বড়।

বললাম, ভদ্র ও অপরিচিতা মহিলাদের আপনি করেই বলতে হয়। আত্মার আত্মীয়কে তুমি বলতে হয়।

সকালে বাড়ি থেকে বের হলাম। দুপুরে বাড়ি ফিরলাম না, এমনকি রাতেও না। এক বন্ধুর বাড়িতে রাত কাটালাম। সকালে বগুড়া গেলাম একটা কাজে। ফিরলাম সন্ধ্যার পরে। ভাবীর কাছে শুনলাম সকাল–দুপুর সে তেমন একটা খায়নি। অর্থাৎ সারা দিন সে অর্ধাহারে আছে। তাকে উপেক্ষা করলাম এবং আমার ঘরে গিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে থাকলাম। মনে হচ্ছে পাগল বানানোর প্রথম ডোজ কাজ করছে। কখন যে ধীর পায়ে সে আমার ঘরে এলো বুঝতে পারিনি।

কোনো কথা না বলে কাপা হাতে আমার হাত ধরে বললো, উঠে আসুন। আমি আপনার কোনো কথা শুনতে চাই না। সারা দিন কোথায় ছিলেন? আপনার জন্য যে একজন কষ্ট পাচ্ছে তার কি খোজ রাখেন?

কোনো কথা বলছি না। যেভাবে শুয়েছিলাম সেভাবেই আছি। আড় চোখে চেয়ে দেখি তার দুই চোখ অশ্রুতে পূর্ণ।

সে বলতে থাকলো, আত্মার আত্মীয় নাই–বা হলাম, আমার কথাটুকু শুনুন। ভাত খাবেন, উঠুন।

উঠে বসলাম। নিজেকে ধিক্কার দিলাম। আমার জন্য একজন কষ্ট পাবে তা তো হয় না। হাত বাড়াতেই সে আমার বুকের ওপর ঝাপিয়ে পড়ল। ফুপিয়ে কান্নার মাঝে অস্ফুট স্বরে অনেক কথা বললো।

তাকে ভালোবাসলাম।

পাগল বানানোর খেলা খতম করে তার সঙ্গে খেতে গেলাম। সে রাতে খেতে অনেক সময় নিলাম। নিজ হাতে ভাত বেড়ে সে আমাকে খাওয়ালো। ধীরে ধীরে কেমন করে যেন আমার বেকার জীবনের ডুবন্ত তরীতে সে দক্ষ মাঝির মতো হাল ধরলো। অজান্তেই তার প্রতি আমার ভালোবাসা নামের গাছটির চারা রোপিত হলো, ক্রমে তার শাখা পল্লবিত হলো।

জুম্মার নামাজ পড়তে যাবো। পাঞ্জাবি পরে টুপি নিতে তার ঘরে গিয়ে দেখি সে সবেমাত্র গোসল করে ভেজা চুল হাতে পানি ঝাড়ার চেষ্টা করছে। গোলাপি রঙের একটা কাপড় পরেছে। তাকে মনে হলো শিশিরে ভেজা একটা গোলাপ ফুল। অবাক চোখে তাকিয়ে আছি।

কপট রাগে সে বললো, এভাবে তকিয়ে আছেন কেন? আমার লজ্জা লাগে!

কোনো কিছু না ভেবেই দুই হাত দিয়ে তার মুখটি তুলে ঠোটে একটা দীর্ঘ চুমু খেলাম।

লজ্জায় সে লাল হয়ে গেল।

আমার ঠোট কামড়িয়ে বলল, এটা কি হলো।

বললাম এটা হলো OK অর্থাৎ Our Kiss।

দেখতে দেখতে পরীক্ষার দিনগুলো শেষ হলে গেল। এরই মাঝে কতো শ OK হলো তা হিসাব রাখতে সুপারকম্পিউটার দরকার। এক বুক স্বপ্ন আর ভালোবাসার পরশ নিয়ে সে বাড়ি চলে গেল। শত চেষ্টা করেও তাকে মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারি না।

ভাবীর বোনের সহায়তায় তার সাথে লুকিয়ে দেখা করি। সুখের সময়গুলো দ্রুত চলে যায়। অনেক কথা গুছিয়ে রাখি। দেখা হলে মনে হয় কথার কোনো শেষ নেই।

একদিন বিকেলে তাদের বাড়িতে গিয়ে ওর মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে পুত্র স্নেহে আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে আশ্বাস দেন এবং বলেন বাবা, আমার মেয়েটা তোমার মতোই পিতৃহীন। তোমাদের আশা আমি পূরণ করবো।

কথা বলতে বলতে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়ে যায়। আকাশে ভরা পূর্ণিমার চাদ। বাড়ির বাইরে এসে দেখি আমার মটর সাইকেলের কাছে ভাবীর সঙ্গে সে দাড়িয়ে। হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে বললাম, ভয় নেই, আমি আছি। আকাশের চাদের মতোই তুমি সুন্দর। আমি তোমাকে কোনোদিন কষ্ট দিতে চাই না। সামনের ঈদের দিন বিকেলে দেখা কররো বলে বিদায় নিলাম।

একটা সমস্যার কারণে ঈদের দিন বিকেলে দেখা করতে পারলাম না।

এর মধ্যে পরীক্ষার রেজাল্ট বের হলো। ফার্স্ট ডিভিশনে সে পাস করলো। তার ভাবীকে সঙ্গে করে মিষ্টি খাওয়াতে আমাদের বাড়ি এলো। নিজ হাতে তাকে মিষ্টি খাওয়ালাম। কিন্তু সুযোগের অভাবে সে আমাকে মিষ্টি মুখে তুলে দিতে পারলো না। এ জন্য নাকি তার পরীক্ষা পাসের আনন্দটাই মাটি হয়ে গেছে। যাবার আগে আমাকে এটাই বলে গেল।

আমার অভিভাবকরা আমার বিয়ের জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন।

আমার পছন্দের কথা জানালাম।

এবার হয়তো আমাদের অপেক্ষার পালা শেষ হবে। আমার এক বন্ধুসহ বড় ভাই বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে ওদের বাড়িতে গেলেন।

পিতৃহীন পরিবারে মা হচ্ছে তাদের অভিভাবক। সব কিছু শুনে তার বড় ভাইয়েরা ও মা প্রস্তাব নাকোচ করে রীতিমতো আমার পাঠানো প্রস্তাবকারীদ্বয়কে অপমান করে বিদায় দিলেন। তাদের খোড়া যুক্তি হলো মেয়ে আমাদের বাড়িতে থেকে পরীক্ষা দিয়েছে, এখন সেই বাড়ির ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিলে লোকে কি বলবে।

এমনিতেই ঘুম হয় না। সেদিন থেকে ঘুম একেবারেই বিদায় নিল। আমার প্রাণপ্রিয় বড় ভাই এক স্ত্রী ও দুই ছেলেমেয়ে থাকতেও অপর একজনের সুন্দরী স্ত্রীকে ভাগিয়ে নিয়ে বিয়ে করেছেন। এতে তাদের মানসম্মান যায়নি। এখন মেয়ে হওয়ার কারণে তার প্রতি এমন স্বেচ্ছাচারিতা মেনে নিতে পারলাম না। কিন্তু কি করবো ভেবে পেলাম না।

দুই দিন পর তার ভাবীর বাড়িতে তার সঙ্গে দেখা করলাম। আমার গোলাপ ফুল মিইয়ে গেছে। একি চেহারা হয়েছে তার! চোখের নিচে কালি পড়েছে। আমাকে দেখেই কান্না শুরু করলো। অনেক আদর ও আশ্বাস দিয়ে তাকে শান্ত করলাম। তার ভাবীর কাছ থেকে জানতে পারলাম পৈতৃক সূত্রে পাওয়া এক টুকরো জমি তার ভাইয়েরা মিলে বিক্রি করছে তার সেজ ভাইয়ের বিয়েতে খরচ করার জন্য। এবং সে বিয়েটাও বর-কনের পছন্দের বিয়ে অর্থাৎ ভালোবাসার বিয়ে। এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে সে নানান গঞ্জনার শিকার হয়েছে। তার কথা কেউ শোনেনি। আমি বিভিন্ন মাধ্যমে অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম।

আমার অভিভাবক আর অপেক্ষা করতে চাইলেন না। তারা মেয়ে দেখতে শুরু করলেন এবং খুব কম সময়েই একটা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা পাকাপাকি করে ফেললেন। অসহায় অবস্থার চূড়ান্ত পর্বে এসে দাড়ালাম। কোনো অবস্থাতেই তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলাম না। তার বিবেকহীন অভিভাবকের জেদের কাছে আমাদের ভালোবাসা পরাজিত হলো।

এ বছর সে ডিগ্রি পরীক্ষা দেবে। খবর পেয়েছি কংকাল ছাড়া তার শরীরে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। যে কলেজ কেন্দ্রে সে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল, আমি আগের কলেজ ছেড়ে সেখানেই যোগদান করেছি। কলেজ চত্বরে পা দিলেই আমার সেই গোলাপ ফুলের কথা মনে পড়ে বুকটা হাহাকার করে ওঠে। যোগ্যতা ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সে অভিভাবকদের স্বেচ্ছাচারিতার কারণে অনার্সে ভর্তি হতে পারেনি।

আমার এখন অনেক ছাত্র-ছাত্রী। কিন্তু সেই আত্মার আত্মীয় ছাত্রীকে আমি যেন নিজ হাতে হত্যা করলাম। দোয়া করি যেন সে ভালোভাবে পাস করতে পারে। আমার ভালোবাসা সব সময়ই তার জন্য থাকবে, থাকবে লক্ষ কোটি OK.

বড়াইগ্রাম, নাটোর থেকে

সাধু সাবধান

– মোরশেদ

ইউনিভার্সিটিতে পড়াকালীন কোনো মেয়েকে ভালো লাগলেও ভালোলাগার অথবা ভালোবাসার কথাটা কখনো অকপটে বলতে পারিনি। কারণ লক্ষ্য করেছি, এই ভালোলাগার বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য হিম্মত প্রয়োজন। দুভাগে ভাগ করা যায় এই হিম্মতকে। এক. অর্থনৈতিক হিম্মত, দুই. নিজেকে একজন প্রথম শ্রেণীর ছাত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার হিম্মত। প্রথমটি একজন ছাত্রের শুরুতেই না থাকলেও বড়লোক পিতার সাপোর্ট এক্ষেত্রে সাবসিডিয়ারি সাবজেক্ট হিসেবে বেশ জোরালো এবং শক্ত অবদান রাখে। বলাবাহুল্য, এ দুটোর কোনোটিই না থাকাতে ছাত্র জীবনে কাউকে ভালোবাসা হয়ে ওঠেনি।

ইউনিভার্সিটিতে চারদিকে যখন প্রেমিক যুগলকে দেখতাম তখন মনে মনে আফসোস হতো বৈকি। মনে মনে ভাবতাম, এ রকম যদি আমার জীবনে কেউ থাকতো! তাহলে মনের অব্যক্ত অনুভূতি শেয়ার করতে পারতাম।

পরক্ষণে যখন সংবিৎ ফিরে পেতাম তখন এই ভেবে আত্মতৃপ্তি পেতাম, *ওগুলো তো বড়দের খাবার* অথবা *আঙুর ফল টক* এমনটি ভেবে।

ছাত্র হিসেবে কলেজ পর্যন্ত সেরা ছাত্রদের মধ্যে অবস্থান থাকলেও ইউনিভার্সিটিতে এসে এই শ্রেষ্ঠত্বে কিছুটা ভাটা পড়ে নিজের পড়াশোনার খরচ নিজেকে যোগাড় করতে হতো বলে। সন্ধ্যার পর থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ওই কাজটা করতে গিয়ে পড়াশোনাতে এর প্রভাব পড়ায় রেজাল্ট বেশি ভালো হয়নি। একজন গড় ছাত্র হিসেবেই সাধারণ রেজাল্ট নিয়ে অবশেষে ইউনিভার্সিটির গন্ডি পার হতে হলো।

শুরু হলো জীবিকা অন্বেষণের পালা। একে একে সাত আটটি যুদ্ধে অংশগ্রহণের পর একদিন বিজয় এলো আমার করায়ত্বে। অর্থাৎ চাকরি নামের সোনার হরিণকে নাগালের মধ্যে পেলাম। যা তা চাকরি নয়, একবারে প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তা। উহ! কি যে অনুভূতি তা ভাষায় প্রকাশ করে বোঝানো যাবে না। আনন্দে সারা রাত ঘুমোতে পারিনি। সারা দেশের মানুষ ঘুমোচ্ছে – অথচ একটি প্রাণী জেগে জেগে তার জীবনের হিসাব–নিকাশ কষছে।

হিসাব–নিকাশটা কি সেটা বুঝিয়ে না বললে পাঠক বুঝবেন না। তাই এর অবতারণা প্রয়োজন। ওই রাতেই যা পাইনি তা পেতে এখন আর বাধা নেই এ রকম একটা হিসাব করলাম। ছাত্র জীবনে ভালোবাসতে পারিনি তাতে কি হয়েছে, এখন তো রাজকন্যাকে পাবো, তাকে ভালোবাসবো জীবনকে এভাবে গড়বো, ওভাবে গড়বো ইত্যাদি নানানভাবে মনে মনে প্রবোধ পেলাম।

আজ দশ বছর পরে হিসাব মেলাতে গিয়ে দেখি সব মিথ্যে। চাকরিটা প্রথম শ্রেণীর পেলেও যাকে বিয়ে করেছি সে প্রথম শ্রেণীর নয় মোটেও।

বিয়ের আগে পাত্রী এসএসসি–তে সেকেন্ড ডিভিশনে উত্তীর্ণ বলে পাত্রীপক্ষ ঘোষণা দিলেও বিয়ের পর জানা গেল সে তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ। এ মিথ্যের জন্যে আজও তাকে ভালোবাসতে পারি না। ইচ্ছে ছিল বিয়ের পর স্ত্রীকে নিজের মতো করে গড়ে তুলবো, ইউনিভার্সিটিতে পড়াবো, বিভিন্ন জায়গায় বেড়াবো ইত্যাদি নানান প্রকার স্বপ্ন। স্ক্রন টেস্টেই টিকলো না। ফলে মনের মতো গড়ে তোলার সে স্বপ্নটা স্বপ্নই রয়ে গেল।

সংসার করতে গিয়ে উম্মোচিত হলো সে একজন বদরাগী মহিলা। রাগ হলে যা মুখে আসে তা–ই বলে, হাতের কাছে যা পায় তা–ই ছুড়ে ফেলে।

রাতে ঘুমের মধ্যে বিশ্রী নাক ডাকে যার আওয়াজ পাশের বাড়ি থেকেও শোনা যায়। বড্ড বিরক্তিকর সে শব্দ। ব্রয়লার জাতীয় গঠন হওয়াতে নাক ডাকার বিষয়টিও প্রকট।

সুন্দরী অথবা আকর্ষণীয় ফিগার এর কোনোটির অধিকারী নয় মোটেও। যদিও তার পরিবার থেকে তাদের কন্যাকে সুন্দরী আখ্যায়িত করা হয় কিন্তু আমার দৃষ্টিতে অর্ডিনারি। তারপরও বিয়ে করেছি। কারণ পাত্রী দেখে রিফিউজ করতে পারিনি মানবিক বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলাম বলে। একটা মেয়েকে দেখে না বললে সে কষ্ট পাবে এই ভেবে না করতে পারিনি। এখন ভাবছি ওটা একটা গুরুতর সিদ্ধান্ত ছিল যে ভুলের খেসারত আজও দিয়ে চলছি। জানি না এর শেষ কোথায় এবং কতদিন বয়ে বেড়াতে হবে?

তাই *সাধু সাবধান!* বিয়ের আগে প্রয়োজনে একাধিকবার ভাবুন অন্তত জীবন সঙ্গিনী নির্ধারণের ক্ষেত্রে। না হলে পস্তাতে হবে।

খুলনা থেকে

সংসার

জীবনে কখনো ভাবিনি নিজের কথা লিখতে বসবো। কিন্তু আজ বসেছি। আমার জীবনের বর্তমান পরিস্থিতিই আমাকে বাধ্য করেছে লিখতে। বুক ফাটা কষ্ট আর বয়ে বেড়াতে পারছি না।

স্কুল থেকে শুরু করে এইসএসসি পর্যন্ত ভালো ছাত্রীর পাশাপাশি ভালো বক্তা হিসেবেও অনেক সুনাম ছিল। বক্তৃতা বা বিতর্কে কখনো সেকেন্ড হইনি। বাবা মায়ের একমাত্র মেয়ে বলেই হয়তো একটু বেশি আদরে মানুষ হয়েছি।

হঠাৎ করেই এইসএসসি পরীক্ষার দেড় মাস আগে বাবা মায়ের পছন্দের ভালো ছেলের সঙ্গে আমার এনগেজমেন্ট হয়ে গেল। আর পরীক্ষার চারদিন পর বিয়ে।

রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে বলেই বাবা মায়ের পছন্দের রাজপুত্রকে বিনা দর্শনে, বিনা বাক্যে জীবনের চিরস্থায়ী দখলিস্বত্ব দিয়ে দিলাম।

অনেক শুভাকাঙ্ক্ষীরাই বলেছিল, তুমি আধুনিক যুগের মেয়ে। এভাবে না দেখে, ছেলের সঙ্গে কথা না বলে বিয়ে করো না।

কিন্তু নিজের ওপর বিশ্বাস রেখে এবং সৃষ্টিকর্তার ওপর আস্থা রেখেই সেই অচেনা যুবকের হাত ধরে চলে গেলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিবেশে।

কিছু দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম আমার স্বামী বাদে যৌথ পরিবারের অন্য কারো সঙ্গে আমার মনের মিল নেই। অশিক্ষিত নিচু মনের পরিবারের সবাই আমার দোষ বের করতে লাগলো। অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তারা মারামারি পর্যন্ত করতে পারে। আমি এসবের কিছুই পারি না।

আমার মন এগুলো করতে সায় দেয় না। আমার ভদ্রতা, শালীনতা, স্বামীর প্রতি ভালোবাসা, বিশ্বাস সবই অন্যদের অপছন্দ। তাই নিয়ে বিয়ের পর থেকেই শুরু হয়ে গেল নানান রকম অশান্তি। অশান্তি যতোই বাড়ুক না কেন, আমার স্বামী শান্তির দূত হয়ে বুক দিয়ে আগলে রেখেছে আমাকে। আজ পর্যন্ত সে আমার সঙ্গে কখনোই জোর গলায় কথা বলেনি। আমার সব বিষয়ে উৎসাহ দিয়েছে। এমনকি আজও পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারছি শুধু তার আগ্রহ এবং সহযোগিতায়। সে সত্যিই অনেক বড় মনের মানুষ। একই বাড়ির সবাই যে সমান হয় না তা তাকে দেখে বুঝতে পারলাম।

মোটামুটি সুন্দরী হওয়ায় বিয়ের আগে অনেক ছেলের কাছ থেকে প্রেমের প্রস্তাব পেয়েছি। কিন্তু পরিবার, বাবা–মায়ের কথা ভেবে তাদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছি। এবং সব ভালোবাসা, প্রেম মনের গভীরে জমিয়ে রেখেছি অদেখা স্বামীর জন্য। তাই যখন দেখলাম তার সঙ্গে আমার মনের অনেক মিল, তখন এতোদিনের জমিয়ে রাখা সবটুকু ভালোবাসা উজাড় করে দিলাম তাকে। একটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো, আমার এবং আমার এই প্রিয় মানুষটির নামের প্রথম অক্ষর একই।

আমার ব্যবসায়ী স্বামীর বিয়ের আগে অনেক টাকা ছিল। তার সিংহভাগই সে না জমিয়ে মা, ভাই–বোন আর তাদের ছেলেমেয়েদের পেছনে ব্যয় করেছে। বিয়ের পর তার ব্যবসার অবনতি হওয়ায় তার আর্থিক অবস্থা খারাপ হতে থাকে।

তার বাড়ির সবার কাছ থেকে সামান্যতম আর্থিক সাহায্য না পেয়ে সে ভীষণ হতাশ হয়ে পড়ে। যারা তার সুদিনের বন্ধু ছিল তারা কেউ–ই তার দুর্দিনে এগিয়ে আসেনি। আমার স্বামীর সবচেয়ে ভালো গুণ হলো, সে কখনোই আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলে না বা কোনো কিছু গোপন করে না। তাই আমাদের সম্পর্কের মাঝে কোনো আড়াল নেই।

একদিন সে আমাকে জানালো যে, সে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু সে ভালো হতে চায়।

সব জেনে প্রচণ্ড দুঃখ পেলাম। কিন্তু ঘৃণা হওয়া সত্ত্বেও তাকে ছাড়তে পারলাম না। আমার প্রতি তার যে অগাধ ভালোবাসা সেটা বিবেচনা করেই তাকে ভালোবাসার কোমল পরশ দিয়ে নেশার হাত থেকে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমিও জানি, প্রিয় মানুষের ভালোবাসা সহযোগিতাই পারে মরণ নেশার হাত থেকে ফিরিয়ে আনতে। এই নেশা করা বাদে আমার স্বামী একজন আদর্শ মানুষ। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ এবং সাহায্য নিয়ে শ্বশুরবাড়ির সবার অমতে আস্তে আস্তে আমার স্বামীকে কঠিন নেশা থেকে মুক্ত করতে পেরেছি।

এই সবই করেছি আমার বাবার বাড়ির সবার অজ্ঞাতে। কারণ তারা জানতে পারলে আমাকে আমার প্রিয় মানুষটির কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতো।

শ্বশুরবাড়ির সবাই ভেবেছিলে তার নেশার কথা জানার পর আমি তাকে ছেড়ে চলে যাবো। কিন্তু আমাদের ভালোবাসার বন্ধন এতোটাই দৃঢ় যে, পারিনি চলে যেতে। মানুষেরই ভুল হয়। ক্ষমাই তো মহৎ গুণ। তাই তাকে ক্ষমা করেছি।

এরই মাঝে আমার কোল আলো করে এসেছে আমাদের প্রথম সন্তান। ছেলেকে নিয়ে এখন আমাদের সুন্দর সময় কাটে।

নেশার কারণে আমার স্বামীর অনেক আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। নিজের জমানো টাকা গেছে, পৈতৃক জায়গা বিক্রি করতে হয়েছে। কষ্ট পেলেও আমরা হাল ছাড়িনি।

আমরা দুজন বিশ্বাস করি টাকার চেয়ে ভালোবাসার শক্তি অনেক বেশি। এই বিশ্বাসকে পুজি করে আমাদের ছেলেকে নিয়ে নতুন করে বাচার চেষ্টা করে চলেছি।

আমার স্বামীর কাছ থেকেই শিখেছি ভালোবাসা কাকে বলে। তাই এই লেখা আমার সবচেয়ে পছন্দের, ভালোবাসার এবং শ্রদ্ধার মানুষ, আমার জীবন সঙ্গীকে উৎসর্গ করলাম।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
সাতক্ষীরা থেকে

ভ্যালেনটাইন- এর খোজে

- অমানিশা

প্রতিবছর ভ্যালেনটাইনস ডে-তে আমি অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষায় থাকি একজন সত্যি ভ্যালেনটাইন এর জন্য। স্বপ্ন দেখি প্রাচীন রোমের সেই কারারক্ষীপ্রধানের কন্যার জীবনের অন্ধকার যেভাবে মুক্ত করে আলো জ্বেলেছিলেন সাধু ভ্যালেনটাইন সেভাবে আমার জীবনেও কোনো সাধুপুরুষ এসে আলোকিত করবে। জীবনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দেবে।

কিন্তু তা হয় না।

প্রতি বছর ভ্যালেনটাইনস ডে আমার জীবনে যেমন নীরবে আসে ঠিক তেমন নীরবে চলে যায়। আমি আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখা শুরু করি। প্রতীক্ষায় দিনগুলো আগামী বসন্তের ফুল, পাখি, প্রজাপ্রতি আর একজন ভ্যালেনটাইন-এর জন্য।

খুব ছোটবেলায় একটা অ্যাক্সিডেন্টে আমার বাম চোখটা নষ্ট হয়ে যায়। এরপর একটা চোখের ওপর নির্ভর করে ইউনিভার্সিটির শেষ ডিগ্রি অর্জন করেছি। লেখাপড়ার পাশাপাশি অতীতে ও বর্তমানে নিজেকে বিভিন্ন সৃষ্টিশীল কাজে নিয়োজিত রেখেছি এবং রাখছি। দেশ-বিদেশের ডাক্তারদের সাজেশন ডান চোখের ওপর বেশি প্রেশার দিয়ে লেখাপড়া করা যাবে না। কারণ বেশি প্রেশার দিয়ে লেখাপড়া করলে আমার জীবনে চিরতরে অন্ধত্ব নেমে আসতে পারে। কিন্তু আমার ইচ্ছা সৃষ্টিকর্তার ওপর রাগ করে আমার ভালো চোখটির ওপর বেশি করে প্রেশার দিয়ে চিরতরে অন্ধ হয়ে যাওয়া। কেননা আমার এই ছাব্বিশ বছরের নারী জীবনের কোনো অর্থ খুজে পাই না। চোখের ওই ত্রুটি ছাড়া আমার আর কোনো মাইনাস পয়েন্ট নেই। মানুষ এবং সর্বোপরি একজন নারী হিসেবে যে যোগ্যতা ও গুণাবলী আমার দরকার তার সব কিছুই আমার মধ্যে রয়েছে। তারপরও আমি শুধু আমার ওই শারীরিক ত্রুটির জন্য প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে অবহেলার স্বীকার হচ্ছি প্রতিনিয়ত।

আমার এই ছাব্বিশ বছরের জীবনে উদার মনের কোনো পুরুষকে পাইনি যাকে ভালোবাসা যায়। যাদের পেয়েছি তারা ছিল সবাই স্বার্থপর, লোভী।

সেন্ট ভ্যালেনটাইনস ডে–র উৎপত্তির মূলে যে কারণটিকে চিহ্নিত করা হয় তার মধ্যে ছিল এক সাধুপুরুষ কর্তৃক একজন অন্ধ মেয়েকে দৃষ্টিদান এবং অবশেষে হৃদয়বিদারক এক প্রেমের পরিণতির কাহিনী। অথচ এই দিনটিতে যারা কম বা বেশি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছেলে কিংবা মেয়ে তারা কতোটুকু সেলিব্রেট করতে পারে। তার খবর কি কেউ কখনো রাখে? জানি রাখে না। তাই যাযাদি, তোমার মাধ্যমে এমন কোনো সাধু ভ্যালেনটাইন–এর সন্ধান করছি যে আমার চোখের আলো জ্বালাতে না পারলেও অন্তত হৃদয়ের আলো জ্বালাতে পারবে। তার খোজ এনে দিতে তুমি আমাকে সহযোগিতা করো।

প্লিজ ভ্যালেনটাইন! তুমি আমার জীবনে এসো। তোমার প্রতীক্ষায় আমি প্রহর গুণছি। হাত বাড়িয়ে রেখেছি। চাইছি তোমার বন্ধুত্ব।

পূর্ণ ঠিকানা বিহীন

ঢাকা থেকে